লাল বেনারসি

– আবদুর রউফ

রফিকমামা আমার আপন মামা নন। তিনি ছিলেন আমার প্রতিবেশী। আমার মাকে তিনি আপা বলে ডাকতেন ও বিশেষ সম্মান করতেন। এই সুবাদে আমরা তাকে মামা বলে ডাকতাম। তাছাড়া আমার আপন মামারা থাকতেন ভারতে এবং কালেভদ্রে আসতেন বাংলাদেশে বেড়াতে। সুতরাং রফিকমামাকেই আমরা নিজের মামা বলে মনে করতাম। আর মামার মাকেও নিজের নানি বলেই ভাবতাম। নানি–মামার তিন কুলে কেউ ছিল না এ দেশে। আমরা শুনেছি মামার জন্মের পর পরই নানা মারা যান। শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে বনিবনা না হওয়ায় নানি শিশুপুত্র মামাকে নিয়ে ভারত থেকে চলে আসেন তার নিজের বাপের বাড়ি বাংলাদেশে।

পিতৃহীন রফিকমামা ছিলেন শান্ত স্বভাবের এবং মা অন্তঃপ্রাণ। নানিও চোখের আড়াল হতে দিতেন না মামাকে। আর নানি ছিলেন খুব কড়া মেজাজের এবং সাফসুতরা। মুখের ওপর জবাব দেয়া ছিল নানির স্বভাবের একটা অন্যতম বৈশিষ্ট। কারো সঙ্গে বনিবনা না হলে নানি তার মুখও দেখতেন না। এবং ছিলেন অসম্ভব জেদি। আমার মনে হয় এই জেদের কারণেই নানি তার শ্বশুরবাড়ির সঙ্গে সব সম্পর্ক ছিন্ন করে চলে এসেছিলেন।

খুব সাফসুতরা স্বভাবের বলে নানি নিজের হাতেই সব কিছু রান্না করতেন। নানির মামি ছিলেন খুব খানদানি ঘরানার মেয়ে। তার কাছে নানি খুব নামি–দামি রান্না শিখেছিলেন। সেই সুবাদে নানি রাধতেন খুব চমৎকার। সেই খানদানি মামির কাছে নানি চমৎকার সব মিষ্টি ও হালুয়া তৈরি করা শিখেছিলেন। মাঝে মধ্যেই নানি হরেক কিসিমের হালুয়া ও মিষ্টি তৈরি করতেন আর আমাদের ডেকে চাখতে দিতেন। সেসব হালুয়া ও মিষ্টির অপূর্ব স্বাদ আজো আমাদের জিভে লেগে আছে।

নানির বয়স বেড়ে গেলে মুশকিলেই পড়লেন রান্না–বান্না নিয়ে। সোজা হয়ে দাড়াতে পারেন না। বাতের ব্যথায় উঠ–বস করতে কষ্ট হয়। এদিকে নানি কাজের মেয়ের হাতের রান্না মুখে তুলবেন না। অগত্যা বাধ্য হয়ে মামাকেই রান্না করতে হয়। নানি সব কিছু বাতলে দেন আর মামা রান্না করেন। মামা পড়লেন ফাপরে। যে মামা কোনোদিন কলসির পানি গড়িয়ে খাননি তিনি রান্না করতে গিয়ে ধোয়া ও ঝাঝে নাকের এবং চোখের জল এক করে ফেললেন। শেষে অতিষ্ঠ হয়ে মামা সিদ্ধান্ত নিলেন বিয়ে করবেন।

অবশ্য পাত্র হিসেবে মামা ছিলেন সুপাত্র। বয়স যদিও একটু বেশি হয়ে গিয়েছিল তবুও মামা ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত। ছাত্র ভালো হওয়ায় অনেক বড় বড় চাকরির সুযোগ মামা পেয়েছিলেন। কিন্তু যখনই কোনো চাকরির নিয়োগপত্র বা ইন্টারভিউ কার্ড পেতেন, নানি কান্নাকাটি শুরু করে দিতেন। কোনো অবস্থাতেই নানি মামাকে কাছ ছাড়া করবেন না। মামাও এ নিয়ে কোনো জোরাজুরি করতেন না। স্থানীয় একটা বেসরকারি কলেজে অধ্যাপনার চাকরি নিয়ে মামা নানিকে দুশ্চিন্তামুক্ত করেছিলেন।

সুতরাং মামার মতো নির্ঝঞ্ঝাট সংসারের পাত্রী জোটানো কোনো সমস্যাই নয়। তবে নানির কড়া মেজাজের কথা ভেবেই সে পথে চেনা–জানা এবং পাড়া–প্রতিবেশীরা এগোয়নি শেষে কি না বদনাম হবে ঘটকের। অগত্যা মামা নিজের চেষ্টাতেই মেয়ে পছন্দ করে ফেললেন।

মামার কাছে আত্মীয়স্বজন তেমন কেউ ছিল না বলে আমরাই বিয়ের যোগাড়যন্ত্র ও তদারকি সব কিছুতে শামিল হলাম। মামার দুলাভাই অর্থাৎ আমার আব্বাকেই হতে হলো বরকর্তা। বিয়ের আগের দিন মামা একটা শাড়ির প্যাকেট নিয়ে এসে বললেন, রুমি, দেখো তো শাড়িটা ঠিক হয়েছে কি না।

প্যাকেট খুলে দেখলাম একটা খুব সুন্দর দামি লাল বেনারসি। মামার কাছে শুনলাম হবু মামি নাকি লোক দিয়ে খবর দিয়েছেন লাল বেনারসি কেনার জন্য। আমরা খুব অবাক হলাম। মোটামুটি সচ্ছল পরিবারে বিয়েতে সাধারণত লাল বেনারসিই কেনা হয়। শাড়ির রঙ ও ধরনের ফরমায়েশ দেয়া আমাদের সমাজের প্রথা বহির্ভূত। তাও আবার খোদ পাত্রীর তরফ থেকে এই ফরমায়েশ!

যাহোক, নির্বিঘ্নেই মামার বিয়ে হয়ে গেল। আমরা নতুন মামি পেয়ে মহা খুশি। নানি বৌমা বৌমা করেন আর মামিকে বিচিত্র সব রান্না শেখান। দিন ভালোই কাটতে লাগলো। মামা হাপ ছেড়ে বাচলেন।

এক শবেবরাতের দিন নানি মিষ্টি তৈরির পদ্ধতি নিয়ে মামির সঙ্গে কথা বলছিলেন। এক পর্যায়ে মামি মুখ ফসকে বলে ফেললেন, এটা একটা মিষ্টি হলো!

ব্যস, এ মন্তব্যটাই মামির জন্য কাল হলো। নানি বিগড়ে গেলেন। এরপর থেকেই শুরু হলো শাশুড়ি–বৌয়ের খিটিমিটি। দিনে দিনে তা বেড়েই চললো। মামি কতো চেষ্টা করলেন। কিছুতেই নানি নরম হলেন না। মাঝে মধ্যেই নানি অকথ্য ভাষায় মামিকে গালিগালাজ দিতে লাগলেন। *কালনাগিনী, হারামজাদি* ইত্যাদি হরহামেশাই বলতেন। এমনকি একদিন মামি এসবের প্রতিবাদ করায় মামিকে *বেশ্যা* পর্যন্ত নানি বলে ফেললেন।

মামির হাতের রান্না করা খাবার নানি খাওয়া বন্ধ করলেন। অকেজো শরীর নিয়ে নিজেই নিজের রান্না করে খেতে লাগলেন। অবস্থা আরো চরমে পৌছালো যখন নানি বলতে লাগলেন, মামি তার খাবারে বিষ মিশিয়ে দিচ্ছেন। শেষমেষ নানি একদিন বলেই ফেললেন বৌ–এর মুখ তিনি দেখবেন না। নানির এসব অযৌক্তিক জেদাজেদিতে মামা একদিন খুব চেচামেচি করলেন। তারপর মামা কলেজে চলে গেলে নানি তার এক দূরসম্পর্কের ভাইয়ের বাড়ি চলে গেলেন। মামি কতো পায়ে ধরলেন, নানি শুনলেন না।

মামা হতবাক হয়ে গেলেন। যে মা তার একমাত্র সন্তানকে ছাড়া এতোগুলো বছর একদণ্ডের জন্য কোথাও থাকেননি আজ সেই সন্তানকে ছেড়ে চলে গেলেন! বিস্মিত ও দিশেহারা মামা ছুটে গেলেন নানিকে আনতে। যাবার আগে মামিকে বলে গেলেন তার বাপের বাড়িতে যেতে। পরিস্থিতি শান্ত না হওয়া পর্যন্ত সেখানেই থাকতো। নানিকে নিয়ে মামা বাড়ি ফিরলেও নানির সেই এক কথা তিনি বৌ–এর মুখ দেখবেন না। মামাকে এ বাড়িতেই আলাদা সংসার পাততে বললেন। তিনি একাই নিজের রান্নাবান্না করে খাবেন। আমার মা বাবাও মতামত দিলেন, আপাতত সেটাই ভালো হবে। কিন্তু মামা নারাজ। তার কথা হলো, যার (নানির) তিন কুলে কেউ নেই সে তার একমাত্র ছেলের বৌকে মেনে নেবে না কেন? এতে করে তিনি চরম অপমানিত বোধ করছেন।

শেষ পর্যন্ত মামা সিদ্ধান্ত নিলেন, তিনি মামিকে ডিভোর্স দেবেন। মামির ভাইদেরকে তিনি তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে খবর পাঠালেন। মামিও এই চরম অশান্তি এবং বিড়ম্বনা থেকে নিজেকে ও মামাকে মুক্তি দিতে মানসিকভাবে তৈরি ছিলেন। তাই মামির ভাইয়েরা কোনো ঝামেলা করলেন না। আপোস–রফায় ঠিক হলো, মামির সমস্ত দায়দেনা মামা পরিশোধ করবেন। জীবনে একবারই বিয়ে এই ভেবে মামা বেশ বড় অংকের দেনমোহরে আপত্তি জানাননি। মামা তার এতোদিনকার সঞ্চয় দিয়ে দেনমোহর এবং খোরপোষ বাবদ সমস্ত টাকা মেটানোর জন্য প্রস্তুত হলেন।

মামির বাড়ির লোকজনদের একটা আত্মসম্মান বোধ আছে। তাই আমাদের বাড়ি তালাক রেজিস্ট্রির জন্য জায়গা হিসেবে নির্ধারিত হলো। এবার নানি নতুন ঝামেলা বাধালেন। তিনি মামাকে সাফ সাফ জানিয়ে দিলেন, বিয়েতে মেয়েকে যে বেনারসি শাড়ি দেয়া হয়েছিল সেটা অবশ্যই ফেরত নিতে হবে। নিজের ছেলের দেয়া বেনারসি পরে *মাগী* অন্য লোককে নিয়ে সংসার করবে তা তিনি হতে দেবেন না। মামা এই নতুন শর্তটাও মেনে নিয়ে মামির বাড়িতে খবর পাঠিয়ে দিলেন। নানি এতেও শান্তি পেলেন না। তিনি মামার কাছ থেকে মামির গহনাগুলো নিয়ে নিজের কাছে রাখলেন পাছে সোজামানুষ মামা শাড়ি ফেরত না নিয়েই গহনা যেনো না দেন। মামা বেশ মোটা টাকার গহনা মামিকে দিয়েছিলেন। নানির ধারণা ছিল, সামান্য শাড়ির বদলে মামির বাড়ির লোকজন এতো টাকার গহনা হাতছাড়া করতে চাইবে না।

নির্দিষ্ট দিনে মামির বাড়ির লোকজন এলেন, সঙ্গে মামি। তালাক রেজিস্ট্রির জন্য কাজিও এসে পড়লেন। মামা অন্য ঘরে বসলেন। তার মুখ শুকনো। গোটা বাড়িতে থমথমে অস্বস্তিকর পরিবেশ। কাজি তার কাজ শুরু করে দিলেন। মামার সই, টিপসই নিলেন। মামির সই ও টিপসই নেয়ার পর কাজি দেনমোহর এবং খোরপোষের টাকা মামির হাতে তুলে দিলেন।

সাধারণত দেনমোহরের টাকা থেকে গহনার মূল্য বাদ দেয়া হয়। এক্ষেত্রে মামা উদারতা দেখিয়েছিলেন। নানির গোয়ার্তুমির কথা মনে রেখে মামা গহনার মূল্য ছাড়াই দেনমোহরের পুরো টাকা পরিশোধ করলেন। এদিকে নানি বার বার শাড়ির জন্য তাগাদা দিতে লাগলেন। কিন্তু মামি বা মামির ভাইদের তরফ থেকে শাড়ি ফেরত দেয়ার কোনো লক্ষণ দেখা গেল না। এদিকে নানির কাছ থেকে গহনা নিতে এসে মামা তাড়া খেলেন। নানির এক কথা, শাড়ির ফেরত না নিয়ে তিনি গহনা হাতছাড়া করবেন না।

শেষ পর্যন্ত জানা গেল, মামি শাড়ি আনেননি। এই খবর নানির কানে গেলে তিনি খুব হৈ চৈ লাগালেন। অবশেষে মামি জানালেন তিনি এখনই গহনা চান না। পরে শাড়ি পাঠিয়ে দেবেন। তখন গহনা দিলেই হবে। নানি এবার শান্ত হলেন।

অতঃপর মামি তার স্বামী সংসার ছেড়ে চিরদিনের মতো বিদায় নিলেন। এভাবে নানি তার একমাত্র সন্তানের সংসার নিজের হাতে ভাঙলেন। কিন্তু নানিকে এতোটুকুও বিচলিত হতে দেখা গেল না।

কথা ছিল, দুই একদিনের মধ্যে মামি শাড়ি ফেরত পাঠিয়ে গহনাগুলো নেবেন। কিন্তু এক মাস পার হয়ে গেল, মামি শাড়ি পাঠালেন না, গহনাও নিলেন না। প্রথম প্রথম নানি খুব হই চই করলেন। তারপর চুপ হয়ে গেলেন। মামাও এ নিয়ে আর কোনো কথা বললেন না।

এর বছর দেড়েক পরে মামির সঙ্গে আমার দেখা হয়েছিল এক এনজিও পরিচালিত গণশিক্ষা কার্যক্রমের এক অনুষ্ঠানে। তখন আর্ট কলেজে পড়ি। ছবির মাধ্যমে শিশুদের শিক্ষাদান কর্মসূচির এই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত হয়ে শহর থেকে অল্প দূরে একটি গ্রামের স্কুলে গিয়েছিলাম। সেখানেই দেখা পাই মামির। মামি একটু শুকিয়েছেন। এছাড়া একই রকম মনে হলো তাকে। মামি আমাকে দেখেই চিনলেন। জানালেন এই এনজিও-র স্কুলে শিক্ষকতার চাকরি নিয়েছেন। অনুষ্ঠান শেষে যে যার বাড়ি ফেরার উদ্যোগ নিচ্ছি। মামি আমাকে একপাশে নিয়ে গেলেন। মনে হলো তিনি কিছু বলতে চান। ইতস্তত করে বললেন, শাড়ি ফেরত না দেয়ায় তোরা খুব অবাক হয়েছিস তাই না?

আমি কিছু না বলে চুপচাপ রইলাম।

মামি বললেন, আজ তোকে বলবো কি জন্য সামান্য একটা শাড়ি আমি ফেরত দিলাম না। তোর মামা যেমন ছোটবেলায় বাবাকে হারিয়েছিলেন, আমিও তেমনি ছোট অবস্থায় মাকে হারিয়েছিলাম। বলতে বলতে মামির দুই চোখ অশ্রু সজল হয়ে উঠলো। তারপর একটু সামলে নিয়ে ভারী গলায় বললেন, তবে আমি তখন খুব শিশু অবস্থায় ছিলাম না। মনে রাখার বয়স তখন আমার হয়েছিল। মা আমাকে প্রায়ই একটা ছোট্ট লাল শাড়ি পরিয়ে বৌ সাজাতেন আর বলতেন লাল বেনারসি পরিয়ে এ রকম করে বৌ সাজিয়ে তোর বিয়ে দেবো। আমাকে জড়িয়ে ধরে চুমুর পর চুমু খেতেন মা। আমার তখন খুবই ভালো লাগতো। মায়ের সেই আনন্দ-উচ্ছ্বাস ভরা মুখ আমার এখনো মনে আছে। তারপর মা মারা গেলে আমার লাল শাড়ি পরে বৌ সাজার খুব ইচ্ছা হতো। কিন্তু সেই সাধ মিটতো না। কেননা মা তো আর নেই। কে আমাকে বৌ সাজিয়ে দেবে? বড় হয়ে মায়ের অনেক স্মৃতিই ভুলে গেছি। কিন্তু লাল শাড়ি পরার স্মৃতি আজো ভুলিনি। মায়ের বড় সাধ ছিল আমাকে লাল বেনারসি পরিয়ে বৌ সাজানোর। তাই যখন বিয়ের সময় এলো তখন তোর মামাকে জানিয়েছিলাম লাল বেনারসি কেনার জন্য। তোরা সবাই অবাক হয়েছিলি নিশ্চয়ই। তবে আমার কেন জানি ভয় হতো বিয়েতে হয়তো লাল বেনারসি পরা হবে না। তাই তো লজ্জার মাথা খেয়ে তোর মামাকে লাল বেনারসি কিনতে বলেছিলাম।

একটানা এতোগুলো কথা বলে মামি থামলেন।

একটা অস্বস্তিকর নীরবতা।

অনেকক্ষণ আমরা কোনো কথা বলতে পারলাম না।

একটা চাপা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো মামির ভেতর থেকে।

তারপর আবার ধরা গলায় বললেন, রুমি, মেয়েদের একবারই বিয়ে হয়। তোর মামা পুরুষ মানুষ, যোগ্য পাত্র। তিনি নিশ্চয়ই বিয়ে করেছেন। নতুন বৌকে দিয়েছেন আরেক বেনারসি। আর এখনো বিয়ে না করলেও করতে পারেন যখন তখন। বৌকে তখন দেবেন নিশ্চয়ই লাল বেনারসি। কিন্তু আমি ভাইদের পরিবারে এক মাতৃস্নেহ বঞ্চিতা মেয়ে। আমার মতো অসহায় মেয়েদের একবার বিয়ে হতেই কতো বিড়ম্বনা। রুমি, বিয়ের ওই লাল বেনারসি দিয়ে আমার মায়ের স্মৃতিটুকু আকড়ে ধরে রাখতে চাই। তোর নানি, মামাকে বলিস আমি গহনা চাই না, লাল বেনারসিটাই চাই।

নির্বাক, নিস্পন্দ হয়ে দাড়িয়ে থাকা আমার চোখ দিয়ে কখন যে জল গড়িয়ে গেছে তা টেরও পাইনি। তাই আমিও বলতে পারলাম না, মামি, মামাও আর বিয়ে করেননি। তিনি আর বিয়ে না করার পণ করেছেন। লাল বেনারসি তিনি আর জীবনে কিনবেন না।

সাগরপাড়া, রাজশাহী থেকে

বুড়ো-বুড়ি

– মামুন

বিপত্তিটা দাদিকে নিয়ে। কোনো শাড়িই তার পছন্দ নয়, অথচ দাদির শাড়ি কেনার গুরুদায়িত্বটা আমাকেই পালন করতে হয়। বুড়ো মানুষের শাদা-মাটা শাড়ি কিনলে বলবে, *ও ছেমড়া, এতো জোলার শাড়ি কম দামি তাতের শাড়ি। এ শাড়ি আমি পিনমু না।*

আবার একটু রঙ-চঙা শাড়ি কিনলে তেড়ে এসে বলবে, *আমারে কি ছুকড়ি পাইছোস, বুড়ো বয়সে ঠমক মার্কা শাড়ি পিনমু।*

কি আর করা, চার পাচবার বদলের পর তবেই তার শাড়ি পছন্দ হয়। তাছাড়া আরেকটি বাতিক রয়েছে তার কারো শাড়ি পরা তার পছন্দ নয়।

বড়আপা শাড়ি পরলে বলবে, শাড়ি পরার কি ছিরি! পেট ঢাকে তো পিঠ ঢাকে না, পিঠ ঢাকে তো পেট ঢাকে না। আবার ছোটচাচি শাড়ি পরলে বলবেন, একেই বলে দায়োস মহিলা, লজ্জা-শরমের বলাই নেই, মাথায় ঘোমটা নেই ইত্যাদি।

মোটকথা, দাদিকে কেন্দ্র করে শাড়ি বিষয়ক জটিলতা চরমে পৌছেছে। বড়আপা একদিন আমাদের সবাইকে নিয়ে এক পরামর্শ সভায় বসলেন। সভার মূল এজেন্ডা, কি করে বুড়িকে শায়েস্তা করা যায়। আমার ছোট বোন নীলু হঠাৎ চেচিয়ে উঠলো, চমৎকার একটা আইডিয়া পেয়েছি। আমরা সবাই তার মুখের দিকে তাকিয়ে পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথাটি শোনার জন্য।

নীলু বুদ্ধিজীবীর মতো বললো, বুড়িকে পাম-পট্টি দিয়ে আপোসে একদিন বৌ সাজাতে হবে, তারপর জমবে মজা।

বড়আপার চোখে-মুখে সংশয়, এটা সম্ভব নয়। বুড়ি রাজি হবে না। কি করা যায়! সবাই চিন্তিত। সবশেষে সর্বসম্মতিক্রমে সিদ্ধান্ত হলো, আগে দাদাকে পটাতে হবে এবং কাজটি করতে হবে বড়আপাকে দিয়ে। কারণ দাদার সবচেয়ে দুর্বল জায়গা হলো বড়আপা।

যেমন কথা তেমন কাজ। দাদার গলা ধরে আহ্লাদি কণ্ঠে বড়আপা বললেন দাদু, তোমরা আর কয়দিন বেচে আছো। আমাদের খুব সাধ দাদা-দাদিকে বিয়ের সাজে বর-কনে হিসেবে দেখতে।

আমরা সবাই মাথা নাড়িয়ে সায় দিলাম। দাদা আমতা আমতা করে রাজি হয়ে গেলেন। আমরা করতালির মাধ্যমে দাদাকে অভিনন্দন জানালাম। সিদ্ধান্ত হলো সতেরো নভেম্বর দাদা-দাদির বাহান্নতম বিয়ে বার্ষিকীতে কাজটি করতে হবে। সময় কাটে না, কবে সতেরো নভেম্বর আসবে।

সবশেষে প্রতীক্ষার প্রহর কাটলো। সকাল থেকেই মহা ধুম-ধাম। ছোটচাচির সবুজ বেনারসি শাড়ি এবং বিয়ের গয়না দিয়ে দাদিকে বৌ সাজানো হলো। চমৎকার মানিয়েছে। মনেই হয় না সত্তর বছরের বুড়ি। দাদাকেও পাগড়ি শেরোয়ানিতে দারুণ লাগছে। বুড়োদেরও যে চমৎকার একটা রূপ আছে এ দৃশ্য না দেখলে বিশ্বাস করাই মুশকিল। মহা ধুম-ধামে কাটলো দাদা-দাদির বাহান্নতম বিয়ে বার্ষিকী।

পরদিন নীলু বাড়ির সব পিচ্চিদের শিখিয়ে দিল বুড়িকে এই বলে খেপাতে –

হায়! হায়! হায়।

লজ্জা শরম নাই

বুড়ো বয়সে বৌ।

তারপর থেকেই বুড়ি চুপসে গেলেন। চুপচাপ, কোনো কথা নেই। যেন পাথর।

১৯৯৯ সালের বারো ডিসেম্বর বুড়ি আমাদের সবাইকে ছেড়ে চলে গেছে পরপারে। এখন বুড়ি নেই। নেই শাড়ি বিষয়ক বিপত্তি। নেই সেই বিপত্তির আনন্দও। আমি আজো শুনতে পাই, বুড়ি যেন বলছেন, *আমি এ শাড়ি পিনমু না।*

বগুড়া থেকে

জয়ী

– একজন হতভাগিনী মা

মা মারা গেছেন অনেক বছর। এর মধ্যে বড় হয়েছি। সংসার হয়েছে, মেয়েও হয়েছে। জয়ী-জয়িতা, আমার দশ বছরের মেয়ে। উচ্ছল, প্রাণবন্ত, আরো অনেক কিছু যা প্রত্যেকটি সন্তানই তাদের বাবা মায়ের কাছে হয়ে থাকে।

মনটা আজ বড্ড বেশি খারাপ। পড়ন্ত বিকেলে স্মৃতির ভাণ্ডারটা উল্টে দিয়ে তাই এসে দাড়িয়েছি এই ছোট বারান্দাটায়। পাশেই আমার স্বামী। শূন্য, ঝাপসা দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ওই নীলপানে। এদিকে চোখের জলে বাধ দেয়ার অদম্য প্রয়াস আমার।

আমাদের বিয়েটা ছিল পছন্দের। বাবা মেনে নেননি। আর ওর বাড়ি থেকে মেনে নেয়ার তো প্রশ্নই আসে না। শিক্ষিতা, বুদ্ধিমতী আর রুচিশীল হলে কি হবে, সোসাইটিতে ঠিক যেন মানিয়ে নেয়া যাচ্ছিল না। ফলে বরাবরের মতো একার সংসার আমার। নতুন সংসারে সামান্য সচ্ছলতা নিয়ে আসার জন্য ওর দিনান্ত পরিশ্রম। মনে পড়ে, জয়ী যখন পেটে, ভীষণ অসুস্থ আর নিঃসঙ্গ ছিলাম। নানান রকম জটিলতার মধ্য দিয়ে আস্তে আস্তে বড় হচ্ছিল ও। এক একদিন যখন খুব কষ্ট হতো, অনেক কষ্ট, আলমারি খুলে মায়ের আকাশি রঙের শাড়িটা বের করে গায়ে জড়াতাম যেন পরম মমতায় মা আমাকে এবং আমার সন্তানকে আগলে রাখছেন সকল অমঙ্গল থেকে। কখন যে দুই চোখে শ্রাবণ নামতো!

মা মারা যাওয়ার পর সুতির শাড়িগুলো সব দিয়ে দেয়া হয়েছিল গরিব মহিলাদের। যদিও সংখ্যায় বেশি না তবুও তো মায়ের শাড়ি। আর দুই একটা যা ছিল, স্মৃতি চিহ্ন হিসেবে তুলে রাখা হয়েছিল

আমার জন্য। মাঝে মধ্যে ভাদ্র মাসে কড়া রোদে শুকানো হতো আবার কর্পূর দিয়ে তুলে রাখা হতো ট্রাংকে। ভাজ খুললে আজো সেই পরিচিত গন্ধ ঠিক কর্পূর নয়, ও যেন মায়ের গন্ধটাই এসে লাগে নাকে।

ডাক্তাররা অনেক কষ্টে বাচিয়েছিলেন জয়ীকে। আর আমি তো মরতেই বসেছিলাম। মায়ের জটিলতার জন্য স্বাভাবিক জীবন যাপনের নিশ্চয়তা পায়নি ও। সারা জীবনের অসুস্থতার গ্যারান্টি দিয়ে ডাক্তারা ওকে তুলে দিয়েছিল আমার কোলে। আমার স্বামী বলছিল, ও নাকি দেখতে আমারই মতো। অথচ ওকে দেখে মায়ের মুখটাই আমার দুই চোখে ভাসছিল। মা নেই তো কি হয়েছে। আমার মেয়ে তো আছে! আমার বুকের ধন, নয়নের মণি। এতোদিন পর আমার মেয়েকে, আমার মাকে ফিরে পেয়ে দুই চোখে নেমেছিল আনন্দের বন্যা।

বাড়তি যত্ন নিতাম জয়ীর। বড্ড বেশি আদুরে আর একটু যেন আলাদা ছিল প্রতিবেশীর বাচ্চাদের চেয়ে। অফিস থেকে ফিরলে বাবার গলা জড়িয়ে গল্প শোনার বায়না ধরতো ও। ভূত-প্রেত এবং রাজকন্যাদের এড়িয়ে ও চাইতো দাদা-দাদি, নানুমণি ও দেশের কথা। তারপর গম্ভীর গলায় বলে উঠতো, নেভার মাইন্ড, ওদের হয়তো কোনো সমস্যা ছিল।

একটু খেললেই হাপিয়ে উঠতো ও। ওর লিকলিকে বাড়ন্ত শরীরটা ক্লান্ত হয়ে পড়তো। তবুও হার মানতো না। প্রথম দিকে স্কুলে তাল মেলাতে পারছিল না। এক সময় ঠিকই ভালো করতে শুরু করলো। কিন্তু শরীরে কুলাচ্ছিল না। আর আমার কোনো বাধা, বাবার কথাও মানছিল না। ভালো তাকে করতেই হবে। শেষে তো এ গ্রেড পেল। এবং সে উপলক্ষে তার বন্ধু কৃস, হ্যারি, জেন-সহ আরো অনেককে নিমন্ত্রণ করলো। অবাক কাণ্ড! এতো ড্রেস থাকতে বেছে নিল মায়ের সেই নীল শাড়িটা।

মা কুচিটা ঠিক আছে তো? আচলটা?

এমন আরো কতো কি! অবাক হয়ে দেখছিলাম আমার মেয়েকে, আমার আত্মজা। একটু লাজুক অথচ গর্বিত হাসি হেসে ও অ্যাটেন্ড করতে গেল ওর বন্ধুদের। জেন তো বলেই বসলো, চমল ফমমপ ্রম ডর্লণ. ঘদর্ট্র্ ´দধ্র ঢরণ্র?

মেয়ে বললো - কদটভপ হমল ।টভণ. র্ঝ্র্ ্রদটরধ. ঈর্ল র্ধ্ বমরণ´দটভ ষদর্ট র্ধ বণটভ্র. র্ঝ্র্ ´দণ্রষণর্ণ বণবমরহ মত বহ ঢণটর থরটভঢবট.

ওদের আনন্দ, ছবি তোলাতুলি আর কোলাহল বেশ ভালো লাগছিল। হঠাৎ এক আর্ত চিৎকারে যেন খাচা ছেড়ে বেরিয়ে এলো আমার হৃদপিণ্ড। জয়ীর কিছু হলো না তো! দৌড়ে গিয়ে দেখি ও মেঝেতে। মলিন চেহারা এবং কাতর তার দৃষ্টি। ওর বাবাকে ফোন করে দ্রুত হসপিটালে গেলাম আমরা। ডাক্তাদের কোনো কথাই কানে আসছিল না। মনে বলছিল পৃথিবীর সব কিছুর বিনিময়ে আমার মেয়েকে চাই। আল্লাহ, তুমি এতো নিষ্ঠুর হয়ো না। কিন্তু তার চেয়েও কি নিষ্ঠুর করে দিয়েছিল আল্লাহ আমাদের হৃদয়? জয়ীর মৃত্যু সংবাদটা আমরা এতো শান্তভাবে গ্রহণ করেছিলাম কিভাবে?

আমার মায়ের কোনো ছবি ছিল না। মেয়ের ছবি আছে। কিন্তু মেয়ে তো নেই। এতো বড় বিশাল বাড়িটায় কোথাও নেই। এমনকি ওর প্রিয় বারান্দাটাতেও না যেখানে ইতি-উতি ঘুরে বেড়ানো মেঘের সঙ্গে রাজ্যের কথা বলতো ও। এখনো মেয়ের খোজে মাঝে মধ্যে উকি ঝুকি দেয় বাচ্চা মেয়েরা। ওরা

তো জানে না আমার জয়ী ওই আকাশি শাড়িটা পরে খেলতে গেছে নীলের দেশে। হালকা মেঘে পা ছড়িয়ে আয়েস করে বসে গল্প করছে নানির সঙ্গে এবং আচল নেড়ে হতভাগা বাবা–মায়ের দিকে তাকিয়ে লাজুক হাসি হাসছে।

নাম ঠিকানাবিহীন

আত্মরক্ষা

– আবদুল হাই আল হাদী

১৯৭১ সালের এপ্রিল কিংবা মে মাস।

যুদ্ধের ডামাডোল চারদিকে। সীমান্তবর্তী এলাকা হওয়ার কারণে প্রথম দিকে যুদ্ধের উত্তাপ কিছুটা কম থাকলেও দিনের পর দিন তা বাড়তে লাগলো।

আমাদের এলাকায় ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের ভালো অবস্থান। ছাত্র, কৃষক, শ্রমিকসহ সর্বশ্রেণীর লোক যেমন স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছে তেমনি সহযোগিতাও করেছে অকাতরে, নিঃস্বার্থভাবে। মুক্তিযোদ্ধাদের সহযোগিতা আর সুসংহত অবস্থানের খবর শুনে পাকবাহিনী ক্ষেপে উঠে ঝাপিয়ে পড়লেও সর্বশক্তি নিয়ে সর্বশ্রেণীর জনতার ওপর। মুক্তিযোদ্ধারা কৌশলগত কারণে এ সময় এলাকা ত্যাগ করলে পাকবাহিনী বাড়িতে বাড়িতে তল্লাশিসহ নিরীহ নারী, শিশু, বৃদ্ধদের ওপর অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিল।

বড় চাচা ছিলেন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান। তিনি ছিলেন মুক্তিযোদ্ধাদের পৃষ্ঠপোষক। অন্য মুক্তিযোদ্ধাদের সঙ্গে তিনি আগেই এলাকা ছেড়েছিলেন। বাড়িতে শুধু মা–চাচিরা। কলেজ পড়ুয়া ছোট চাচা অসুস্থতার কারণে বাড়ি ছাড়তে পারেননি। পরের দিন ছাড়বেন এবং কোনো সমস্যা হবে না এ মনোবলে তিনি বাড়িতে রয়ে গেলেন।

সেদিন ছিল শুক্রবার। দুপুরের খাবার খেতে সবাই বসেছেন। খাবারের মাঝখানে এসে কাজের লোক জানালো যে, পাকবাহিনী বাড়ি ঘেরাও করেছে। তারা কোনো পুরুষ লোক বাড়িতে থাকলে তাকে বের করে দিতে বলছে। না দিলে তারা পুরো বাড়ি তল্লাশি করবে।

বড় চাচি আমার ছোট চাচাকে শাড়ি, বোরখা পরার নির্দেশ দিয়ে বাইরে বের হলেন। তিনি পাকসেনাদের বললেন, বাড়িতে কোনো পুরুষ লোক নেই। কিন্তু পাকসেনারা তা বিশ্বাস করলো না। তারা বাড়িতে তল্লাশি চালাতে চাইলো। বড় চাচি তাদেরকে তল্লাশি চালাতে রাজি হলেন এ শর্তে যে, বাড়ির মহিলারা বাড়ি ছেড়ে যাওয়ার পর তারা যেন তল্লাশি করে। পাকসেনারাও এতে আপত্তি করলো না।

বড় চাচি ফিরে এসে তিনি এবং অন্যান্যরা বোরখা পরে বেরিয়ে গেলেন। ছোট চাচাকে বললেন, তার শাড়ি যেন বাইরে থেকে দেখা যায়। কারণ পাকসেনারা শুধু বোরখাকে সন্দেহও করতে পারে।

মা, চাচিরা স্ত্রীবেশী ছোট চাচাসহ সবাই বেরিয়ে পড়লেন।

ছোট চাচা সবার মাঝখানে। দোয়া দরুদ পড়তে পড়তে তারা বেরিয়ে ফুফুর বাড়িতে চলে গেলেন। পাকসেনারা একটুও সন্দেহ করতে পারেনি।

আমার বড় চাচির উপস্থিত বুদ্ধি এবং বিশেষত শাড়িই সেদিন ছোট চাচাকে রক্ষা করেছিল নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে। শাড়ি না হলে অন্য যে কোনো মেয়েলি পোশাক তাকে রক্ষা করতে পারতো না। তাই আবহমান এ বাঙালি পোশাকের প্রতি আমরা কৃতজ্ঞ। দীর্ঘস্থায়ী হোক আমাদের স্বদেশি এ পোশাক।

চট্টগ্রাম থেকে

অভিশাপ

আমাদের ব্যবসায়ী পরিবারটির একটি বড় জেলা শহরে বেশ প্রভাব। আমাদের প্রধান ব্যবসা ছিল কাপড়ের। নিজ শহরের বাইরেও ঢাকা, চট্টগ্রাম, এমনকি কলকাতা থেকেও শাড়ি কাপড় কেনা-বেচা চলতো। বড় দুই ভাই আব্বুর মতো পুরোদস্তুর ব্যবসায়ী হয়ে পড়েছিলেন। দোকান ও ব্যবসার কাজে অনেক কর্মচারী নিয়োজিত ছিল। তার মধ্যে সবচেয়ে স্মার্ট ও সুদর্শন ছিলেন শিবলীভাই। আব্বুর প্রচণ্ড বিশ্বস্ত ছিলেন। বড় বড় লেনদেন, ঢাকা-কলকাতায় ছোটাছুটি সব শিবলীভাই-ই করতেন। মাঝে হঠাৎ বাসার ভেতরে আসলেও তাকে আমাদের অনেকটা ভেতরের লোক বলেই মনে হতো।

আমি যখন সবে হাই স্কুলে তখন থেকেই শিবলীভাই আমাদের সঙ্গে আছেন। তার স্মার্টনেস আমার ভালো লাগতো। তার মধ্যে ছিল একটা চিরতারুণ্যের ভাব। মৃত্যুর শেষ দিনটি পর্যন্ত এ ভাবটি তিনি ধরে রেখেছিলেন। নিজকে মাঝে মধ্যে তার প্রতি দুর্বল মনে হলেও কাউকে তা ঘুণাক্ষরেও বুঝতে দিইনি। হাজার হলেও আমাদের কর্মচারী! আমার আর তার মাঝে সামাজিক বিরাট ব্যবধান।

সেই অভিশপ্ত দিনটির ঘটনা। তখন সবে মেডিকাল কলেজে অ্যাডমিশন নিয়েছি। বন্যায় কলেজটি প্রায় ডুবে যাওয়ায় ক্লাস হচ্ছে না। বাসাতেই সময় কাটছে। পড়ন্ত বিকেল। প্রকাণ্ড বাসার দোতলাতে আম্মু নিজ রুমে তখনো শুয়ে আছেন। দারোয়ান, কাজের লোকগুলো সব গেটের বাইরে। একাকী বাসায় আমি ঘুরপাক খাচ্ছি।

এক সময় স্টোর রুমে উকি দিলাম। সেখানে স্তূপাকারে রাখা অনেক শাড়ি। একটা নীল শাড়ি খুব মনে ধরলো। *নেই কাজ তো খৈ ভাজ!* শাড়িটি নিয়ে নিজের রুমে এলাম। ড্রেসিং টেবিলের সামনে নিজের খোলস ছাড়লাম। গায়ে থাকলো শুধু অন্তর্বাস। ধীরে ধীরে শাড়িটি দিয়ে নিজেকে ঢাকলাম। কিন্তু শাড়িটি খুব পাতলা ছিল। তাই আয়নায় নিজের আকর্ষণীয় অংশগুলো দেখে নিজেই লজ্জা পেলাম। কেমন শিহরণও বোধ হলো। নিজের স্পর্শকাতর অঙ্গগুলোয় নিজেই হাত বোলালাম। হঠাৎ আয়নায় শিবলীভাইকে দেখে চমকে উঠলাম। কতোক্ষণ তিনি ঘরে এসে দাড়িয়েছেন জানি না। চোখে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, তুমি কেমন আছো?

অস্ফুট স্বরে বলতে পারলাম, ভালো নেই।

শিবলীভাই এগিয়ে এসে কাধে হাত রাখলেন। কি, মন খারাপ?

এমনিতেই উত্তেজনায় কাপছিলাম। তার উপর নির্জন বাড়ি, স্পর্শ, হ্যান্ডসাম এক যুবক আমার ঘরে। কেমন যেন হয়ে গেলাম এই আমার আমি। আমার এতোদিনের মিথ্যা প্রতিরোধ হঠাৎই ভেঙে গেল। আচমকাই তার বুকে আছড়ে পরে তার পিঠ খামচে দিলাম। বুকে নাক ঘষলাম, মুখ ঘষলাম। এক সময় আবিষ্কার করলাম আমার নরম দুটি ঠোঁট তার সিগারেটের গন্ধযুক্ত দুটি শক্ত ঠোটে। তার অসহিষ্ণু হাত দুটো চলতে থাকলো আমার শরীরের অসমতল জায়গাগুলোতে। কেমন এক ভালোবাসা আমাকে অন্ধ করে ফেললো। আমাকে তিনি আরো শক্ত করে আকড়ে ধরলেন। আমার শরীর আগলা হয়ে আসছিল।

ওরে বাবারে, মরে গেলাম, চিৎকার করে আমাকে ছেড়ে দিয়ে অকস্মাৎ ছিটকে পড়লেন শিবলীভাই। আমার মনে হলো তার মেরুদণ্ডের কয়েকটি হাড় ভেঙে গেল এক বুটের লাথিতে। ডেঞ্জারম্যান সেজভাইয়া দরজায় দাড়িয়ে। ওর চোখ দিয়ে আগুনের হলকা ছুটছিল। বুঝলাম এটা ভাইয়ার ক্রোধের সর্বোচ্চ স্তর। আমাকে আম্মুর ঘরে যেতে বলে ভাইয়া দরজা আটকিয়ে দিলেন।

আম্মুর ঘরে এসে খুব করে কাদলাম। সেজভাইয়াকে শুধু আমরা বাড়ির মানুষ, পাড়ার মানুষ না, শহরের নামকরা টেররাও হিসাব করে চলে। ভাইয়া কোনো এক অজ্ঞাত কারণে শিবলীভাইকে পছন্দ করতেন না। কিন্তু আমাকে ভালোবাসতেন প্রচণ্ড রকম। গভীর রাতে কয়েকবার গোঙানির মতো আওয়াজ পেলাম। রাতে না খেয়েই আম্মুর ঘরে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

আমার যখন ঘুম ভাঙলো তখন বাসায় অনেক পুলিশ। বাইরে পাড়ার উৎসুক শুভাকাঙ্ক্ষীরা। স্টোর রুমের সিলিং থেকে শিবলীভাইয়ের ঝুলন্ত লাশ নামিয়ে নিয়ে গেল খাকি পোশাকের লোকেরা। আমি বিস্ময়ে হতবাক। হায়, আমার সামান্য ভুলের মোহে এ কি ঘটলো!

এ সমাজ টিকে থাকার প্রধান দুটি হাতিয়ার অর্থ এবং দাপট দুটোই আমাদের ছিল। তাই পরিবারের কয়েকজন পুরুষ সদস্যকে কিছু সময় শুধু থানায় বসে থাকতে হয়েছে। শিবলীভাইয়ের মৃত্যু সুইসাইডাল না হোমিসাইডাল তা আদালতের বিষয়। পুলিশ রিপোর্ট অনুযায়ী এটি আত্মহত্যাই বটে! আমার ভয়ার্ত বিমর্ষ চেহারা দেখে ভাইয়া বলতেন দেখ, এটা একটা অ্যাক্সিডেন্ট, ভুলে যা।

আমিও ভুলতে চাই। কিন্তু পারি না। পারা যায় না। আজ আমি বিবাহিতা। এতোগুলো বছর পরও মাঝে মধ্যে নিজেকে সাইকিক বলে মনে হয়। স্বাভাবিক থাকতে খুব চেষ্টা করি। সারাক্ষণ হাসি-খুশি ভাব ধরে রাখি। বিয়ের কনে সাজার আগ পর্যন্ত আর শাড়ি পরিনি। এখনো শাড়ি আমি পছন্দ করি না। তবু স্বামীদেবতাকে সঙ্গ দিতে মাঝে মধ্যে আমাকে তা পরতেই হয়। একাকী ঘরে শাড়ি পরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাড়ালেই আয়নায় শিবলীভাইয়ের মুখ দেখা যায়। খুব গম্ভীর সে মুখ। ছুটে ঘরে থেকে বেরিয়ে আসি। শাড়ি আমার জীবনের এক অভিশাপের নাম।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
ঢাকা থেকে

রক্তে ভেজা

আমি তখন ক্লাস ফাইভে পড়তাম। যদিও ক্লাসের দিক দিয়ে ছোট ছিলাম কিন্তু শরীরের দিক দিয়ে যথেষ্ট বড় ছিলাম। আমি প্রাইভেট পড়তাম এক প্রাইমারি স্কুল টিচারের কাছে। স্যার দেখতে যেমন সুন্দর তেমনি নম্র ও ভদ্র ছিলেন।

একদিন শখ করে শাড়ি পরে নির্ধারিত সময়ের পাচ মিনিট আগে প্রাইভেটে গেলাম। স্যার দেখে বললেন, তোমাকে খুব সুন্দর মানিয়েছে। খুব সুন্দর লাগছে।

স্যার পড়াতে বসালেন। স্যার খাটে। আমি তার বাম পাশে। চেয়ারে আরো একজন ছাত্র ও দুইজন ছাত্রী। তারা টেবিলের অন্য সাইডে বসা।

এক সময়ে বুঝলাম টেবিলের সাইড দিয়ে স্যার প্রথমে আমার হাতে, তারপর আমার বুকে হাত রাখলেন। আমারও একটু একটু ভালো লাগছিল। আবার সে আমার স্যার। তাকে বাধাও দিতে পারি না।

কিন্তু পরক্ষণেই ঘটলো আমার নারী জীবনের সবচেয়ে বড় দুর্ঘটনা। স্যার শাড়ির নিচ দিয়ে আমার গোপন অঙ্গে হাত রাখলেন এবং আঙুল ঢুকিয়ে দিলেন। প্রচণ্ড রকম ব্যথা পেয়ে উহ শব্দ করলাম। স্যার তাড়াতাড়ি হাত সরিয়ে নিয়ে আমাকে ছুটি দিয়ে দিলেন।

বাসায় গিয়ে দেখি শাড়িতে রক্ত। তখন বুঝতে না পারলেও এখন বুঝতে পারি আমার কি অমূল্য সম্পদ হারিয়েছি।

সেদিনের পর থেকে আর শাড়ি পরিনি। কিন্তু স্যার থেমে থাকেননি। সেই থেকে মাঝে মাঝে আমাকে আঙুল দ্বারা ধর্ষণ করতেন। অবশ্য আমার ভালো লাগতো। কিন্তু ক্ষতিটা বুঝতাম না। সব ছাত্রছাত্রী সামনে থাকলেও কারো কিছু দেখার কিংবা বোঝার উপায় ছিল না।

আমরা এক কলোনিতে থাকতাম বলে বড় হয়েছি একই জায়গায়। তাই বড় হয়ে জানতে পারলাম বাকি দুইজনও আমার মতো আঙুল ধর্ষণের শিকার হয়েছিল।

বুকে হাত দেয়াটা ছিল তার নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। স্যারের মান সম্মানের কথা ভেবে ও আমাদের ইজ্জতের কথা ভেবে কাউকে বলতে পারিনি। কেননা কুকর্ম করে পুরুষ আর ইজ্জত যায় মেয়েদের। সমাজ জানলে খারাপ চোখে দেখে মেয়েদের এবং পুরুষ থাকে সাধু।

তবে সেদিনের সেই শাড়ি পরাটাই আমার জন্য কাল হয়েছিল। এখন শাড়ি দেখলে অথবা পরতে বললে আমার ভয় হয়, না জানি আবারও রক্তে ভিজে যায়। কিন্তু সেটা আর সম্ভব নয়। কেননা সেটা তো নারীর জীবনে একবারই হয়।

নাম ঠিকানাবিহীন

অমলিন

– নাজমা রহমান

আমার বাবা ছিলেন মিলের একজন সাধারণ কর্মচারী। আমরা ছিলাম দুই বোন, এক ভাই। ভাইবোনের মধ্যে আমিই বড়। আমি ক্লাস টেন-এ পড়তাম আর আমার ছোট দুই ভাইবোন প্রাইমারি

স্কুলে লেখাপড়া করতো। আমার লেখাপড়া চালাতে বাবার খুব কষ্ট করতে হতো। আমাদের আর্থিক অবস্থা ছিল খুবই খারাপ।

আমার মা ছিলেন খুবই সহজ–সরল একজন মানুষ। শত দুঃখ কষ্টের মধ্যেও আমার মা সব সময় হাসিখুশি থাকতেন। তিনি কখনো আমাদেরকে সংসারের অভাব অনটনের কথা বুঝতে দেননি। আমার মা ছেড়া শাড়ি পরে থাকতেন। কিন্তু আমাদেরকে সাধ্যমতো ভালো কাপড়–চোপড় বানিয়ে দিতেন। আমার মায়ের বাইরে যাওয়ার জন্য ভালো কোনো শাড়ি ছিল না।

একদিন নানির বাড়িতে বেড়ানোর জন্য আমরা বায়না ধরলাম। কিন্তু মা যেতে চাইলেন না। কারণ জিজ্ঞাসা করায় মা বললেন, বাবার বাড়িতে যে যাবো, আমার তো কোনো ভালো কাপড়–চোপড় নেই। এই ছেড়া, পুরনো শাড়ি পরে কিভাবে যাবো। তখন বাবা কিছুই বললেন না। আমাদেরও আর নানি বাড়িতে যাওয়া হলো না।

একদিন রাতে বাবা মায়ের জন্য একটা সুন্দর শাড়ি কিনে আনলেন। আমরা দেখে সবাই অনেক খুশি হলাম। কতোদিন হলো মাকে একটা ভালো শাড়ি পরতে দেখি না। কিন্তু মা একটুও খুশি হলেন না। বাবাকে বললেন, সংসারের এই অভাব অনটনের মধ্যে কি দরকার ছিল এ শাড়ি কেনার।

আমরা ভাইবোন সবাই বললাম, মা, শাড়িটা পর না, তোমাকে কেমন দেখায় দেখি।

মা বললেন, কোথাও বেড়াতে গেলে তখন পরবো। এদিকে বছর শেষ হয়ে এলো। এসএসসি পরীক্ষার ফরম ফিল আপের সময় ঘনিয়ে এলো। বাবা–মা চিন্তায় অস্থির কিভাবে এতোগুলো টাকা এক সঙ্গে যোগাড় করবেন।

ফরম ফিল আপের সময় শেষ হতে চললো। আর মাত্র দুই দিন বাকি আছে। বাবার বেতন পেতে আরো দশ দিন বাকি আছে। বাবা অনেক চেষ্টা করেও টাকা জোগাড় করতে পারলেন না। এতো কষ্ট করে এতো দূর এগিয়ে এসে যদি টাকার অভাবে পরীক্ষা না দিতে পারি এই ভয়ে কান্নাকাটি শুরু করলাম।

মা বললেন, যেভাবেই হোক তোকে আমরা পরীক্ষা দেয়াবো। এদিকে দুই দিন সময় থেকে একদিন পেরিয়ে আর সময় আছে মাত্র একদিন। রাতে বাবা বাসায় ফিরলেন। বাবা বললেন, অনেক চেষ্টা করেছি কিন্তু কোথাও থেকে টাকা জোগাড় করতে পারলাম না। টাকার অভাবে বুঝি মেয়েটার পরীক্ষা দেয়া হবে না এই বলে বাবার চোখে পানি এসে গেল।

মা কিছুই বললেন না। হাউ মাউ করে কাদতে লাগলাম। কিছুক্ষণ পরে মা উঠে আলমারি খুলে আমার নানার হাতের শেষ চিহ্ন মায়ের হাতের এক জোড়া সোনার চুড়ি এবং বাবার দেয়া সেই নতুন শাড়িটা বের করে বাবার হাতে দিয়ে বললেন, শাড়িটা এখনো পরিনি। যেই দোকান থেকে শাড়িটা এনেছো সেই দোকানে কিছু টাকা কমালে শাড়িটা তারা ফেরত নেবে।

বাবা বললেন, অনেক শখ করে তোমার জন্য এ শাড়িটা এনেছিলাম। তুমি তো একদিন পরেও দেখলে না। মা বললেন, আবার টাকা হলে আরেকটা শাড়ি কিনে দিও।

বাবা পাথরের মূর্তির মতো কিছুক্ষণ বসে রইলেন। তারপর এগুলো হাতে নিয়ে বাবা বেরিয়ে গেলেন। আমার মা তার পরনের ছেড়া শাড়ির আচল দিয়ে তার চোখের পানি মুছতে লাগলেন। রাত দশটার

সময় বাবা শাড়ি এবং গহনা বিক্রি করে মায়ের হাতে টাকা এনে দিলেন। সেই টাকা দিয়ে আমার পরীক্ষার ব্যবস্থা করলেন।

মায়ের আগে থেকেই হার্টের অসুখ ছিল। দিন দিন মায়ের অবস্থা খারাপ হতে লাগলো। টাকার অভাবে মায়ের চিকিৎসা করাতে পারিনি। আমরা পারিনি আমার মাকে ভালো একটা শাড়ি কিনে দিতে। এভাবে ধুকে ধুকে একদিন আমার মা এই নিষ্ঠুর পৃথিবী থেকে চিরবিদায় নিলেন। আমাদের প্রচণ্ড ভালোবাসাও আমার মাকে এই পৃথিবীতে আটকিয়ে রাখতে পারেনি। মৃত্যুর সময়ও আমার মায়ের পরনে ছিল মলিন ছেড়া শাড়ি। আজো আমার মায়ের সেই ছেড়া শাড়িটিকে শেষ চিহ্ন হিসেবে রেখে দিয়েছি। আজো যখন আমার মায়ের সেই শাড়িটাকে দেখি তখনই আমার চোখের সামনে ভেসে উঠে শত কষ্টের মাঝে হাসি মাখা সেই মুখ।

আজ আমার সংসার হয়েছে। আমার স্বামীর টাকা পয়সাও আছে। ইচ্ছা করলেই এখন দামি দামি শাড়ি কিনতে পারি। আমার এখন কোনো শাড়ির অভাব নেই। কিন্তু অভাব রয়েছে আমার মা-র। এখন আর কেউ মমতা মাখা হাতে মাথায় হাত বুলিয়ে দেন না। যতোদিন পৃথিবীতে বেচে থাকবো ততোদিন আমার মায়ের সেই ছেড়া শাড়িটিকে অমলিন স্মৃতি হিসেবে রেখে দেবো।

কাউরিয়া পাড়া, নরসিংদী থেকে

হ্যালোইন কসটিউম

– সেলিম

আমি তখন পড়াশোনার কাজে আমেরিকার লস এঞ্জেলেসে। আর বসবাস তারকা খচিত হলিউড এলাকায়। আমার বাসার খুব কাছেই বিখ্যাত ম্যানার্স চায়নিজ থিয়েটার। চব্বিশ ঘণ্টা টুরিস্টদের ভিড় লেগেই আছে ওখানে। হলিউডের বিখ্যাত সব স্টারদের হাতের ছাপ এবং পায়ের ছাপ দেখার জন্য টুরিস্টরা হুমড়ি খেয়ে পড়ে। হলিউড বুলেভা-র (চওড়া পথকে বুলেভা, ঈমলফণশটরঢ, বলে) দুই ধারে ঘটফপ মত এটবণ. রাস্তার ফুটপাথে তারকাদের নামাঙ্কিত স্টার বা তারা বসানো। দূরে সবুজ পাহাড়ের গায়ে শাদা কাঠ দিয়ে লেখা হলিউড। এ হলিউড বুলেভাকে ঘিরে নানান রকম উৎসব লেগেই আছে। অক্টোবর মাসের শেষ দিনটিতে হ্যালোইন উৎসবের জন্য সন্ধ্যা সাতটার পর এই হলিউড বুলেভাতে সব রকমের যান চলাচলের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। হ্যালোইন বালক বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীদের উৎসব। হ্যালোইন উৎসবের একটা বড় অংশ হ্যালোইন কসটিউম। বলা যায়, ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক যেমন খুশি তেমন সাজো। সন্ধ্যার পর বালক-বালিকা, কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতীরা বিভিন্ন ধরনের সাজপোশাক পরে নেমে আসে হলিউড বুলেভাতে। উৎসব চলে রাত দশটা পর্যন্ত। বেশ ফানি, উপভোগ্য।

ঠিক তেমনি এক শীতার্ত সন্ধ্যায় তার সঙ্গে দেখা। সেদিন সবার মতো আমিও গিয়েছি হ্যালোইন উৎসব দেখতে। সঙ্গে আমার বন্ধুর মা। খালাম্মা শাড়ি পরেই এসেছেন। বিভিন্ন রকমের সাজপোশাক

ও ফান এনজয় করতে করতে ঘুরে বেড়াচ্ছি। মাঝে মধ্যে ক্যামেরায় কিছু ছবিও তুলে রাখছি। হঠাৎ ঘটফপ মত এটবণ-এ হাই বলে সে এগিয়ে এলো। ধবধবে ফর্শা তন্বী এক আমেরিকান তরুণী। পরনে শাড়ি, শাদা জমিনের ওপর বেগুনি কাজ। কপালে লাল টিপ। চমৎকার সুন্দর মানিয়েছে। খালাম্মার পরনে শাড়ি দেখে নিজেই আগ্রহী হয়ে আলাপ করতে এসেছে। হাত বাড়িয়ে দিয়ে মিষ্টি হেসে বললো, আমার নাম লিসা।

বললাম, এতো সুন্দর শাড়ি তুমি পরলে কিভাবে? আর কিভাবেই বা আগলে রাখছো?

লিসা হাসতে হাসতে বললো, আমার এক ইনডিয়ান বন্ধু উপহার দিয়েছে। কোমরের দিকে ইলাস্টিকের সঙ্গে কুচিগুলো ফিক্স করা। কাজেই পরতে এবং চলাফেরা করতে তেমন অসুবিধা হচ্ছে না।

তোমাকে কিন্তু দারুণ মানিয়েছে। আজকের উৎসবের বেস্ট হ্যালোইন কসটিউম তোমার শাড়ি।

লিসা আনন্দে খিল খিল করে হেসে উঠলো। স্বতঃস্ফূর্ত হয়ে আমাদের সঙ্গে দাড়িয়ে ছবি তুললো। তারপর বিদায় নিয়ে ভিড়ের মাঝে মিলে গেল।

হলিউড বুলেভার হ্যালোইন উৎসবে নানান রকম পোশাকের সঙ্গে কোনো আমেরিকান তরুণী আমাদের অতি পরিচিত সুন্দর এবং নান্দনিক পোশাক শাড়ি পরে আসবে এটা কল্পনারও বেশি ছিল আমার কাছে। মাঝে মধ্যে অ্যালবামে ছবিটা দেখলে কিছুটা গর্ববোধ করি এবং আনন্দিত হই বাংলাদেশের সুন্দর পোশাক শাড়ির জন্য।

টরন্টো থেকে

ফুলশয্যায়

–কাজী মোহাম্মদ নূর-উল ফেরদৌস রবি

সম্পর্কটা যখন আপনি থেকে তুমিতে নামলো, এক রাতে ফোন করে জানতে চাইলাম, শোনো, তুমি নিজে নিজে শাড়ি পরতে জানো তো? নাকি প্রথম প্রথম আমিই পরিয়ে দেবো?

একটু লজ্জা মেশানো কণ্ঠে বললো, বিয়ের পর সব সময় শাড়ি পরে টিপিকাল বঙ্গবধূ হয়ে থাকতে হবে নাকি?

হাসতে হাসতে বললাম, না, বাসর রাতে বিয়ের শাড়িটা খুলে আবার একটা বিয়ের শাড়ি পরতে হবে তো এ জন্যই জিজ্ঞাসা করা।

তখনো চাকরি করি না। নিজের টাকায় বৌকে বিয়ের শাড়ি কিনে দেয়ার সামর্থ হয়নি। এবং এরপরই তাকে ঘটনাটা জানিয়ে বললাম, তোমার হবু বেকার বর বিয়ের শাড়ির ব্যবস্থা করে রেখেছে অনেক আগেই। হাসতে হাসতে তার বিষম খাবার দশা।

আমি তখন খুবই ছোট। বিয়ে, ভালোবাসা কি জিনিস বুঝে উঠিনি। একদিন ক্লাস ওয়ান-এর *সবুজ সাথী* বইয়ের *জুলেখার বিয়ে* গল্পটা পড়াতে গিয়ে যখন স্যার জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ে অর্থ কি?

কিছুক্ষণ ভ্রূ কুচকে উত্তর দিলাম (ক্লাসের ফার্স্টবয় কিছু একটা না বললে প্রেস্টিজ থাকে না), স্যার, বিয়ে অর্থ হাঙ্গা (সাঙ্গা)।

স্যার কয়েক মুহূর্ত চুপ থাকার পর হো হো করে হাসতে হাসতে ক্লাস থেকে চলে গেলেন এবং এর কিছুক্ষণ পর স্যারদের কমনরুমে আমার ডাক পড়লো। স্যাররা হাসতে হাসতে জিজ্ঞাসা করলেন, বিয়ের এই অর্থ আমি কোথায় পেয়েছি? বললাম, খুব বেশি দুষ্টামি করলে আমার বুবু (নানু) আমাকে একজন মোটা মহিলার সঙ্গে *হাঙ্গা* করিয়ে দেবেন বলে ভয় দেখান।

আবার কমনরুমে হাসির রোল এবং স্কুল ছুটি হওয়ার আগেই বোধহয় পুরো স্কুলে আমার বিয়ের অর্থটা জানাজানি হয়ে গেল। বড় আপুরা এগিয়ে এসে আমাকে জিজ্ঞাসা করতে লাগলো, আমি হাঙ্গা করতে রাজি কি না? হাঙ্গা করতে লাল শাড়ি, গয়না ইত্যাদি দিতে তাদের আমি পারবো কি না?

এর কিছুদিন পর আম্মা যখন তার আলমারি গোছাচ্ছিলেন তখন সবচেয়ে উজ্জ্বল লাল শাড়িটা দেখে ওটা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন, সেটা তার বিয়ের শাড়ি। তার শ্বশুর তাকে দিয়েছিলেন। কি মনে করে একটু গম্ভীর হয়ে মাকে বললাম, তুমি এটা কাউকে দেবে না। আমার বৌয়ের জন্য রেখে দেবে। আম্মা মুচকি হেসে বললেন, ঠিক আছে।

টেলিফোনে সেই রাতে তাকে বললাম, আম্মাকে না জানিয়ে ওই শাড়িটা আমার আলমারিতে এনে রাখবো, তুমি বাসর রাতে তোমার বিয়ের শাড়ি খুলে এটা পরে আব্বা আম্মাকে সারপ্রাইজ দেবে।

সে রাজি হলেও আমি কিছুতেই ত্রিশ বছর আগের সেই শাড়ি, ওড়নার হদিশ পেলাম না কিছুতেই। পরিকল্পনার পরী উড়ে যাচ্ছে তাহলে? আম্মার শাড়িটা কি নষ্ট হয়ে গেছে? বিয়ের আগে ভেতরে ভেতরে আমার মন খুবই খারাপ।

আকদ অনুষ্ঠানের দিন সকালে বাসার সবাই মিলে বিশাল সুটকেসসহ তাদের বাসায় হাজির। কবুল বলে খাওয়া-দাওয়া শেষ। তাদের বাসা থেকে আরো মন খারাপ (একে তো পরিকল্পনা কল্পনাই রয়ে গেছে তারপরে বিয়ে করে ফিরে যাচ্ছি বৌ ছাড়া) করে বের হচ্ছি, কে যেন বললো, যা এক নজর দেখে আয়। যাক, তাও কম কি? লজ্জা-টজ্জা ভুলে তার দিকে তাকিয়ে তো আমার চোখ বড় বড়। দেখি আমার মায়ের ত্রিশ বছর আগের বিয়ের শাড়ি, ওড়না পরে লাল টুকটুক বৌ সেজে বসে সে।

আশপাশে তাকিয়ে দেখি হাসছে সবাই। ঘোমটা মাথায় লজ্জাবনত তার মুখেও মুচকি হাসি দেখে বুঝলাম এই ষড়যন্ত্রে সেও একজন।

পরের রাতে কমিউনিটি সেন্টার এবং বাসার সব অনুষ্ঠান শেষে ফুলে ফুলে সাজানো আমার রুমে ঢুকে দেখি ফুলশয্যায় বসে আছে সে।

আমাকে দেখে আস্তে করে বললো, এখন কি আবার ওই শাড়িটা পরবো?

গভীর আবেগে তাকে কাছে টেনে কানে কানে বললাম, এটা এবং ওটা তোমার ছেলের বৌয়ের জন্য তুলে রেখো সযত্নে।

ধানমন্ডি, ঢাকা থেকে

ইচ্ছার মৃত্যু

– অনামিকা

এ রঙের শাড়ি এখন আর আমার সংগ্রহে নেই। কেননা শাড়ি পরার আগ্রহ এখন নেই বললেই চলে। মানুষের জীবনে বয়সটা সব না হলেও মূলে তো বটেই। একটা বয়সে যা ভালো সেটা পরবর্তী কালে হাস্যকর মনে হয়। আমার এখন এমন বয়স হয়ে যায়নি যে, শাড়িতে বেমানান লাগবে। বরং অনেকে এখনো আমাকে অবিবাহিতা মনে করে ভুল করে। আমার এখন প্রচুর শাড়ি। কিন্তু পরার মতো আগ্রহ নেই। অফুরন্ত সময়। তবে কার জন্য করবো? নিজের জন্য? আমি তো নিজের থেকেও আমার প্রিয়জনকে বেশি ভালোবাসি যে কি না আজ আমার স্বামী। আমাকে সে এখনো অনেক ভালোবাসে। যদিও অতীতের সে ভালোলাগা মুগ্ধতা আজ প্রায় মৃত। যা আছে তার নাম স্রেফ দায়িত্ব।

আমার কৈশোরের শুরুর দিকে প্রেমে পড়ি। এসএসসি পরীক্ষার্থী। কি দুরন্ত সে প্রেম! যার জন্য জীবন দেয়াও সম্ভব। একটানা দশ বছর প্রেম করার পর ২০০০-এ স্বামীর ঘরে প্রবেশ করি। একটা মানুষকে কি এতো বছর ভালোবাসা যায়? গেলেও টিকিয়ে রাখা আরো বেশি কষ্টকর। আমি এমন একটা পরিবারের মেয়ে যা অতিরিক্ত রক্ষণশীল না হলেও প্রেমের ক্ষেত্রে আপোসহীন।

আমাদের মধ্যে দেখা হতো রোজই। মানে ছাদ থেকে। কিন্তু বাইরে দেখা করা ছিল কষ্টকর। একবার বাইরে দেখা করার সুযোগ এলো। দিনটা ছিল কোরবানির ঈদ। সে বেশ কিছুদিন আগে থেকেই আমাকে অনুরোধ করে চলেছে এবার শাড়ি পরে আসতে হবে। আমার উচ্চতার কারণেই হয়তো শাড়িতে আমাকে মানিয়ে যায়। যথাসময়ে ঈদ এলো। আমার তো চোখ থেকে ঘুম হারাম। বাসা থেকে কিভাবে, কি বলে কখন বের হবো সেসব ভেবে অস্থিরতায় ভুগছিলাম বেশ কিছুদিন।

শাড়ি নামে পোশাকটা তার খুব প্রিয়। যে কারণে আমারও প্রিয়। কিন্তু অনেক প্রিয়কে একটা সময়ে বিসর্জন দিতে হয়েছে। আমার কেনা নতুন তাতের শাড়িটা নির্বাচন করলাম। সম্পূর্ণ শাড়িটা শাদা। তার আচলটা লাল রঙের সুতায় কাজ করা।

যথাসময়ে শাড়ি পরে তৈরি হয়ে আম্মাকে বললাম, আমি বান্ধবীর বাসায় যাচ্ছি।

আম্মা তো রেগে অগ্নিমূর্তি। একে তো বাড়িতে কিছু কাজ, তার মধ্যে শাড়ি পরে সেজেগুজে যাচ্ছি। দেখা দিল সন্দেহ।

মনে মনে আল্লাহকে স্মরণ করলাম। কোনো বাধা যেন না আসে। যথাসময়ে বের হলাম। এবং নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দেখি সে উপস্থিত। অবাক দৃষ্টিতে আমাকে দেখছে। আমরা ওয়াটারফ্রন্টে গেলাম। অনেক প্রেমিকযুগল ছিল। আমাকে অনেকেই দেখছিল। সে অনেক ধরনের প্রশংসার বাণী শোনালো। এক সময়ে শুরু হলো বৃষ্টি। আমরা তো ভিজে কাক। তারপর গেলাম ওর এক বন্ধুর বাড়ি। দুজনের অবস্থা দেখে ওরা তো হেসে অস্থির।

আমার মধ্যে প্রচণ্ড টেনশন কাজ করছিল। কেননা কিছুক্ষণ পরই বাসায় যেতে হবে। এ অবস্থায় আমাকে দেখলে নির্ঘাত লঙ্কাকাণ্ড। আমাদের একটা রুমে ওরা একাকী গল্প করতে দিয়ে পাশের রুমে চলে গেল। সে মুহূর্তে বন্ধুর মা-বাবা ছিলেন অনুপস্থিত। আমি যখন ফ্যানের বাতাসে শাড়ি

শুকাচ্ছিলাম তখন সে মুগ্ধ দৃষ্টিতে আমাকেই দেখছিল আর বার বার বলছিল, আমাদের বিয়ের পর সব সময় শাড়ি পরে থাকতে হবে। আমাকে সে নিজ হাতে সাজাবে।

সব বাধা অতিক্রম করে আজ আমরা একে অপরকে পেয়েছি। অনেক কিছু পেয়েছি। কিছু অর্জন করতে হলে দিতেও হয়। আমাকেও অনেক ছাড় দিতে হয়েছে। তার ব্যস্ততার মাঝে আমাদের সে ইচ্ছার মৃত্যু ঘটেছে।

শাড়ি পরার লগ্ন হয় না। যদিও বা হঠাৎ পরি সে আর আগের মতো অবাক দৃষ্টিতে তাকায় না। তার ওই মধুর বাণী আর শোনা হয় না – আমাকে সব সময় শাড়ি পরতে হবে।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন, বাসাবো, ঢাকা থেকে

টপেটা

– ফয়েজউল্লাহ মনসুর

স্মৃতির শরীরে ধুলো জমেছে অনেক। তাছাড়া আজকের অবস্থান পূর্বাপেক্ষা অনেকটা সুসংহত বলে ফেলে আসা জীবনের স্পর্শকাতর অনেক ঘটনাই সমভাবে স্পর্শ করে না। নিরন্তর জীবনের দীর্ঘ পথ পরিক্রমায় স্মৃতি হাতড়িয়ে বেড়ানোর মতো অবসর ও ধৈর্য দুইয়ের ঘাটতি রয়েছে।

১৯৭৪ সাল। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস অতি দ্রুতই বিস্তৃতি পাচ্ছিল। আমাদের পরিবারও রাহুমুক্ত ছিল না। ফলে নিতান্তই প্রয়োজনের পরিসীমা ডিঙিয়ে স্বাদ-আহ্লাদ পূরণ করার মতো অবস্থান ছিল একেবারেই অসম্ভব।

সরকারি চাকরিজীবী বাবা। সহকর্মীর কাছ থেকে শুনে এসেছেন স্থানীয় ন্যায্য মূল্যের দোকানে নতুন একটি শাড়ি এসেছে, দামও কম। শাড়ির নাম *টপেটা।*

বাবার ইচ্ছা মায়ের জন্য একটি কিনবেন। মাকে জানালেন। মা নিজেই বাদ সাধলেন। শখ-সাধ্যের অসমন্বয়ের মাঝে বাড়তি কোনো খরচেই ছিল তার আপত্তি। তবে শাড়ি প্রাপ্তির আগ্রহ রূঢ় বাস্তবতার নিরিখে হারিয়ে গেলেও আমার কিশোর মন কিছুতেই সায় দিচ্ছিল না। মাকে শাড়িটি দিতেই হবে। তাই প্রস্তুতি নিলাম।

তখনো দ্রব্যমূল্য সর্বত্রই ঊর্ধ্বমুখী। রেশনের দোকানে দেয় চাল, আটা, তেল, চিনিসহ যাবতীয় কিছু আমাকেই তুলে আনতে হয়। আমার সাইকেলের হ্যান্ডলের দুই পাশে ও পেছনের ক্যারিয়ারে ঝুলিয়ে রেশন প্রতি সপ্তাহে আমিই বাসায় নিয়ে আসতাম। তবে কদাচিৎই পুরো রেশন তোলা হতো। কারণ দুটি। প্রথমত টাকার সংকুলান হতো না। দ্বিতীয়ত. বাবার পৈত্রিক আবাস থেকেও কিছু চাল আসতো। তাই চিন্তা করলাম, রেশন পুরোটাই তুলবো। মাকে কৃচ্ছ্রতা সাধনের উপদেশ (?) দিয়ে, শাড়ির টাকা যোগাড়ের পথে পা বাড়ালাম।

রেলওয়ের আবাসিক এলাকা থেকে প্রায় দুই কিলোমিটার দূরে বিহারি বাজার। সরদার বাহাদুরের স্কুল মাঠে সকল বিহারিরা কোনো রকম তাদের ঠাই করে নিয়েছে। স্বল্প পুজি দিয়ে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য করে বেশ যুৎসই অবস্থানেই আছে। রেশনের সকল সামগ্রী খোলামেলাভাবেই সেখানে

বেচাকেনা হয়। তা দেখেই উদ্বুদ্ধ হয়েছিলাম। প্রতি সপ্তাহের রেশনের চালের অর্ধেক অংশ, কিছু চিনি এবং তেল সেখানেই বিক্রি শুরু করলাম।
বেশি দিন যেতে হলো না। দুই মাসের মাথায় দুই শত একুশ টাকা যোগাড় হয়ে গেল। শাড়ির দাম তিন শত বারো টাকা। আমার কিশোর মনের খুশি দেখে কে? মাটির ব্যাংক ভেঙে আরো প্রায় চল্লিশ টাকা হলো। সবগুলো টাকা এক সঙ্গে নিয়ে বাবাকে বললাম শাড়ির জন্য ন্যায্য মূল্যের দোকানে যেতে। বাবা হতবাক! কোথায় এতো টাকা পেলি? নিঃসঙ্কোচে আমার ব্যবসায়িক সাফল্যের বয়ান করলাম। তেমন খুশি হলেন না, বললেন, তুই তো চোরাকারবারী হয়েছিস!
এর অর্থ বুঝলাম না। তবে এতোটুকু বুঝলাম মায়ের শাড়ি হবেই। বাবাকে বাধ্য করলাম আজই ওই দোকানে যেতে হবে এবং শাড়িটি আনতে হবে।
পাচ কিলোমিটার হেটে সিডিএ মার্কেটে পৌছালাম। লম্বা লাইন। রাত আটটায় মোড়কে মুড়িয়ে বাপ–ছেলে শাড়ি নিয়ে বাসায় পৌছালাম। এ যেন কলাম্বাসের আমেরিকা জয়। আনন্দ আর ধরে না। ক্লান্ত অবসন্নতায় জড়িয়ে থেকেও ওই রাতেই মাকে বাধ্য করলাম শাড়িটি পরে আসতে। লজ্জায় আনত চোখে আমার মা শাড়ি পরে আমাদের সামনে দাড়ালেন। বাবা দেখলেন। আমাকে জড়িয়ে ধরে বাবা তার প্রিয়তমার দিকে নির্বাক তাকিয়ে থাকলেন।
দীর্ঘ সতেরো বছর পার হয়েছে। বাবা পরলোকে গেছেন। তার ছেলেমেয়েরা প্রতিষ্ঠিত। মায়ের শাড়ির সঙ্কুলান হয় না ঘরে আলমারিতে। যাযাদির জন্য লিখে যখন তাকে শোনালাম তখন আমাকে নিয়ে তিনি আলমারি খুললেন। শাড়ি দেখলেন এবং আবেগ জড়ানো কণ্ঠে বলে উঠলেন, আজকের এতো শাড়ি কার জন্য পরি? কাকে দেখাবো? তোর ওই একটি টপেটা শাড়ি আমাকে যে আনন্দ দিয়েছিল, আজকের সবগুলোও তা এনে দেয় না।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

জাপানিজ

– তাহমিনা আবসার

নতুন বৌ। চোখ মুছতে মুছতে অনভ্যস্ত হাতে শাড়ি সামলিয়ে বরের হাত ধরে বিদেশ যাত্রা করলো সুরভি। বরের আবার শাড়ির প্রতি দুর্বলতা। তাই কষ্ট করেই তাকে রফত করতে হচ্ছে শাড়ি পরা। প্রতি পদক্ষেপে হোচট খেয়ে চলতে হচ্ছে। ব্যাংককে প্রথম যাত্রা বিরতি। শাড়ির কারিশমায় প্রায় সকলের চোখ সুরভির দিকে। আরো বিব্রত হচ্ছে সে। দ্বিতীয় বিরতি হংকং।
হানিমুন করতে জাপান পৌছালো সে। পৌছাতেই জাপানিজ প্রফেসর বিরাট রিসেপশন দিলেন নবদম্পতিকে। আবার বিয়ের শাড়ি পরতে হলো। সব বিদেশিদের সপ্রশংস দৃষ্টির সামনে সঙ্কুচিত হয়ে পড়লো সে। নতুন দেশ, এ জন্য ভাষা বোঝে না। কিন্তু শাড়ি যেন দেশ, ভাষা সব কিছুকেই অতিক্রম করে সবাইকে আপন করে তুললো। সদ্য পরিচিত যে কোনো জাপানিজ ভদ্রলোক অথবা ভদ্রমহিলা

দুই চারটা কথার পরেই বলেন, তোমার পোশাকটা খুবই সুন্দর, এটা কি করে পরতে হয়? অবশেষে সলজ্জ আবেদন, শাড়িটা কি একটু ছুয়ে দেখতে পারি?

পরে এ শাড়িই সমস্যার কারণ হয়ে দাড়ালো। কোথাও শাড়ি পরে একা বের হলেই দেখা গেল, অযাচিতভাবে লোকজন কথা বলতে এগিয়ে আসে। বিশেষ করে রবিবারে যদি শপিংয়ে যায় তাহলে দুই একজন মাতাল এতোই বন্ধুত্ব ভাবাপন্ন হয়ে এগিয়ে আসে যে তাদের ছাড়ানোই মুশকিল হয়ে পড়ে। কোথাকার, কোনো চেনা নেই, জানা নেই বিদেশি ছাত্র, যেমন চায়না, কোরিয়া বা আমেরিকা প্রভৃতি দেশের ছাত্র এসে সবিনয়ে পাশে দাড়িয়ে ছবি তোলার অনুমতি চায়। না বলার কোনো উপায় থাকে না। শেষে বিশেষ উপলক্ষ ছাড়া শাড়ি পরা বাদই দিতে হয়েছিল তাকে। নতুন বরের সঙ্গে অভিমান করে একদিন পার্কে বসে আছে। কিন্তু সেই শাড়ির মাহাত্মে বেশিক্ষণ একা থাকা গেল না। তাড়াতাড়ি বাড়ির রাস্তা ধরতে হলো।

জাপানিজ মেয়েরা শাড়ি উপহার পেতে খুবই ভালোবাসে। একবার ল্যাব-এর সবাই দলবল মিলে উষ্ণ পানির ঝরনার শহর *অইটা*-তে বেড়াতে গেল। পুরো শহরটা যেন ধুয়ার শহর। পাহাড়ের ওপর থেকে তাকালে দেখা যায় অভূতপূর্ব দৃশ্য। সঙ্গে শাড়িও নিতে হলো কয়েকখানা। কারণ জাপানিজ বান্ধবীদের বায়না তাদের শাড়ি পরিয়ে দিতে হবে। ফিগার সচেতন জাপানিজ মেয়েদের শরীরে সুরভির ব্লাউজ ঢল ঢল করতে থাকে। তবুও শখ বলে কথা! শাড়ি পরে ছবি তোলার হিড়িক পরে যায়।

শাড়ি পরার কায়দা শেখাতে গিয়ে শ্রান্ত হয়ে পড়ে সে। বান্ধবী কেইওকো-র বাড়ি সেখানেই। তার বাড়িতেই মজা করে থাকা হলো। তার মায়ের কাছেই শিখলো কি করে কিমনো পরতে হয়। তাদের পরিবারের সবচেয়ে দামি কিমনোটা পরার সুযোগ হলো। বান্ধবী কেইওকো-কে একটা শাড়ি প্রেজেন্ট করলো সে। বিনিময়ে পেল তাদের ঐতিহ্যবাহী পোশাক কিমোনো।

জাপানের জাতীয় টিভি এনএইচকে-র লোক এসে হাজির। তারা এই শাড়ি পরা মেয়েটার দৈনন্দিন জীবন, লেখাপড়া এসব দেখাতে চায়। সুরভি গৃন হাউজে কি কাজ করে। তারপর বাসায় তার দাম্পত্য জীবন, রান্না-বান্না, খাবার পদ্ধতি ইত্যাদি সব রেকর্ড করে দেখালো। সবই শাড়িরই মাহাত্ম।

রাজশাহী ইউনিভার্সিটি থেকে

ভাগ্য

– তাসমিয়া

আমাদের যাদের অনেক শাড়ি আছে। তারা কতোই না ভাগ্যবান। কিন্তু আমরা কি কখনো ভাবি সেই সমস্ত ভাগ্য বিড়ম্বিত মেয়েদের কথা যারা নিজের সম্ভ্রমটুকু ঢাকার জন্য পায় না এক চিলতে কাপড়। আমি সমস্ত ভাগ্যবান মেয়েদেরকে আহ্বান করছি, সেই সমস্ত ভাগ্যহীনদের সাহায্য করতে, নতুন না সম্ভব না হলে পুরনো শাড়ি এবং পোশাকগুলো অবশ্যই দিতে পারেন।

নওমহল, ময়মনসিংহ থেকে

এক রাতের কমলা শাড়ি

– শান্মী

বিয়ে করেছিলাম পালিয়ে। বছরখানেক কেটে গেল প্রেমিক–প্রেমিকার মতো। ধীরে ধীরে জানাজানি কিন্তু দুপক্ষের কেউ–ই রাজি নয় মেনে নিতে। আমি তখন অনার্স ফার্স্ট ইয়ারে। সে ডাক্তারিতে সেকেন্ড ইয়ারে। ঘণ্টা মেয়াদে রিকশায় ঘুরে বেড়ানো এবং বিশাল কলেজ ভবনের ফাকা ক্লাস রুমে একটু আধটু ঘনিষ্ঠতা এভাবেই চলছিল।

এমন সময় ঢাকা থেকে খুলনায় বেড়াতে গেল আমার সদ্য বিবাহিত বান্ধবী, সঙ্গে তার বর। বিয়ের এতোদিন পরে আমরা এখনো পরস্পরের হাত ধরাধরি এবং দুই চারটা চুমুতে সীমাবদ্ধ আছি জেনে ধিক্কার জানালো। সাহস দিয়ে বললো, ঢাকায় আয়। হাফ ডাক্তারের সঙ্গে আলাপ করতেই হাতে আকাশের চাদ পেল যেন। প্ল্যান করলাম আবার পালাবো। একদিন ক্লাসে যাবার ছলে ব্যাগে ভরে নিলাম প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র। সারাদিন কলেজে কাটিয়ে সন্ধ্যা নাগাদ বাসে চড়ে বসলাম ঢাকার উদ্দেশ্যে। যাবার সময় এক বন্ধুকে দায়িত্ব দিলাম বাসায় আম্মার কাছে যেন খবরটা পৌছে দেয়।

খুব ভোরে ঢাকায় পৌছে দেখি বাসস্ট্যান্ডে বান্ধবীর বর দাড়িয়ে আছে। ভেবেছিলাম হয়তো বান্ধবীর বাসায় নিয়ে যাবো। কিন্তু একি? নিয়ে ওঠালো ফকিরাপুলের খুব বাজে শ্রেণীর এক হোটেলে। আমি তো রেগে টং হয়ে আছি। স্বামীরত্ন এবং বান্ধবীর বর দেখি ভালোই জমিয়েছে।

বেলা একটু বাড়তেই বান্ধবী এসে হাজির। আমি পারলে তার ঘাড় মটকাই। শেষ পর্যন্ত যা বললো তা হলো, তার বাসাতেই ওঠাতো। কিন্তু গতকালই গ্রাম থেকে তার শ্বশুর–শাশুড়ি হাজির। বাসাও তেমন বড় নয়। অগত্যা এই ব্যবস্থা। আমি তখনো যথেষ্ট চড়া।

বললাম, তাই বলে এ রকম হোটেলে?

সে বললো, হোটেলের মালিক তার বরের এক ঘনিষ্ঠ আত্মীয়। হোটেলগুলোতে আজকাল কতো রকম কাণ্ড হয়। এটা অন্তত সেদিক থেকে সম্পূর্ণ নিরাপদ।

অনেকক্ষণ থেকে তারা বিদায় নিল। আমরা মোটামুটি ফ্রেশ হয়ে বেরিয়ে পড়লাম। সারা দিন এদিক সেদিক ঘোরাঘুরি করে রাতে ফিরে এলাম হোটেলে। রাত যতো গভীর হতে লাগলো ততোই আপসেট হতে লাগলাম। নাহ, আমার বাসর রাত এভাবে হতেই পারে না। অসম্ভব। এক্ষুণি ফিরে যাবো খুলনায়।

পতিদেব যতো বোঝায় আমি ততোই অবুঝ, না এ রকম থার্ড ক্লাস মার্কা হোটেলে আমার ফুলশয্যা হবে না, কিছুতেই না। এরপর ফর্মুলা বদল করে আমার স্বামী।

ঠিক আছে, কালই চলে যাবো। রাতটুকু গল্প করে কাটিয়ে দিই?

সম্মতি পেয়ে খুব কাছাকাছি বসে গভীর চোখের দৃষ্টিতে কাবু করার চেষ্টা করে। খুব ভালো গানের গলা ছিল তার। কুমার বিশ্বজিতের সে সময়কার একটা গান খুব প্রিয় ছিল আমাদের। *আমি সাম্পানে বাধিব ঘর, তুমিই সাথী হলে।* এর কণ্ঠের সবটুকু আবেগ ঢেলে গেয়ে শোনালো।

বললাম, আরেকটা গাও।

সে গেয়ে শোনালো। শেখ ইশতিয়াকের *নীলাঞ্জনা, ঐ নীল নীল চোখে চেয়ে দেখো না।* লাকী আখন্দের *এই নীল মনিহার এই স্বর্ণালী দিনে তোমায় দিয়ে গেলাম শুধু মনে রেখো।* গান শুনতে শুনতে কখন যে তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে পড়েছি নিজেই জানি না। আমার চোখের মুগ্ধতা একটু সাহসী করে তুললো তাকে।

বললো, আমাদের প্রথম রাত, কিছুই দেবে না তুমি?

কেমন যেন মায়া হলো। বললাম, চোখ বন্ধ করে বসে থাকবে যতোক্ষণ খুলতে না বলি।

বাধ্য ছেলের মতো দেয়ালের দিকে মুখ করে বসলো। আমি ব্যাগ খুলে বের করলাম খুব অল্প দামের একটা কমলা রঙের জর্জেট শাড়ি, কমলা পেটিকোট সঙ্গে কালো ব্লাউজ। সুন্দর করে গুছিয়ে পরলাম। কপালে কমলা টিপ, কানে-গলায় সামান্য আভরণ। আমি দেখতে খুব সুন্দরী কখনোই ছিলাম না। অন্তত চেহারা দেখে প্রেমে পড়ার মতো তো নয়ই। কিন্তু সে রাতে আয়নায় নিজেকে অচেনা মনে হচ্ছিল।

তাকে বললাম, এবার তাকাও।

বিদ্যুৎ গতিতে ঘুরে তাকালো সে। এরপর স্লো মোশন ছবির মতো ধীরে ধীরে আমার সামনে এসে দাড়ালো। আমি টুপ করে সালাম করলাম তাকে। দুই হাতে টেনে দাড় করালো আমাকে।

একটা শব্দ উচ্চারিত হলো শুধু *অপূর্ব!*

তারপর অনাদিকাল ধরে সেই চিরন্তন ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি।

সেই ছিল আমার প্রথম শাড়ি। আমার স্বামীর প্রথম নির্ভেজাল মুগ্ধতা।

এদিকে আম্মা ঢাকায় খবর পাঠালো আমার আত্মীয়স্বজনদের কাছে। বান্ধবীর মাধ্যমে আমার খোজও পেয়ে গেল। আমার খালাতো বোনের বাসা ছিল মোহাম্মদপুরে। তার বাসায় নিয়ে গেল আমাদের। অনেক রাত পর্যন্ত দুলাভাইসহ অন্যরা গল্প করলো আমাদের সঙ্গে। এরপর যে যার রুমে।

মধ্য রাত থেকে শুরু হলো তুমুল বৃষ্টি। আগের কয়েকদিনের গরমের পর সেদিনের বৃষ্টিতে গল্প করতে করতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি টেরই পানি। সকালে ঘুম ভাঙলো আপার দরজা নক করার শব্দে। সকাল নটা কিন্তু মনে হচ্ছিল ঘন কালো সন্ধ্যা। জানালার বাইরের মায়াময় অন্ধকার থেকে চোখ আটকে গেল জানালার পাশেই টেবিলের ওপর রাখা আমার ব্যাগে। ব্যাগটা অমন চুপসানো কেন? মুহূর্তেই বুঝলাম ব্যাগের ভেতরকার সব কিছুই নিয়ে গেছে। নিয়ে গেছে আমার অমূল্য সম্পদ কমলা রঙের শাড়িটাও। হু হু কান্নায় ভেঙে গেল বুকটা। শাড়ি নয়, আমি যেন অনেক বড় কিছু হারিয়ে ফেলেছি।

এরপর অনেকবার অনেক রকম শাড়ি পড়েছি কিন্তু ডাক্তার সাহেবের সেই দৃষ্টি খুজে পাইনি কোনোদিন। এখনো প্রশংসা শুনি। তবে সেই রাতের মতো নয়।

হোটেলে শাড়ি পরা আমাকে দেখে সত্যিই কি অতোটা মুগ্ধ হয়েছিল সে? নাকি ভান? সত্যিই যদি হবে এ পর্যন্ত কটা শাড়ি কিনে দিয়েছে সে আমায়। কাছাকাছিই ছিল আমার স্বামী।

জিজ্ঞাসা করলাম, এই তুমি কি নিজ হাতে একটাও শাড়ি কিনে দিয়েছো আমাকে?

ডাক্তারি বই থেকে মুখ না তুলেই বললো, কেন, সেদিনই না দুটো সিল্ক শাড়ি কিনে আনলাম।

আমি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ি। তাই তো। এতোটা ভুলে যাই কিভাবে? সম্ভবত এই দেয়ার পেছনে কোনো বিশেষত্ব নেই, শুধুই রুটিন ওয়ার্ক সে জন্যই।

মৌচাক, ঢাকা থেকে

আবেদন

গত বছর সেপ্টেম্বরে বিয়ে হলো আমার প্রিয়তমার সঙ্গে। এক মাসেরও কম সময় দেশে অবস্থানের পর চলে এলাম বিদেশে। বিয়ের পর প্রথম ঈদ উপলক্ষে কিছু উপহার পাঠালাম। দ্বিতীয় ঈদে কিছু টাকা পাঠিয়ে একটা শাড়ি কিনতে অনুরোধ করলাম। সে শাড়ি কিনতে রাজি হয়নি বার বার বলার পরও। তার এক কথা, যে ঈদে মনের মানুষকেই কাছে পাই না সেখান শাড়ি দিয়ে কি হবে? অনেক বলার পর সে রাজি না হওয়ায় শেষে রাগারাগি হলো। তাতেও তার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করানো গেল না।
তার কথা, যখন তুমি দেশে আসবে, যতো খুশি উপহার দেবে, আমি গ্রহণ করবো। তাছাড়া কোনো বিশেষ উপলক্ষেই আমি আর কোনো উপহার নেবো না।
দেশে কর্মসংস্থানের অভাবে আমরা দেশ ছেড়ে প্রিয়জনদের আদর, স্নেহ, ভালোবাসা থেকে বঞ্চিত হই। আর প্রিয়জনেরা আমাদের অভাব অনুভব করে প্রতি মুহূর্তেই। দেশে আমাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা হলে আমরাও পরিবার পরিজনের ভালোবাসা নিয়ে থাকতে পারতাম।
তাই দেশের রাজনৈতিক নেতাদের কাছে আবেদন, পরস্পরের হানাহানি বন্ধ করে দেশকে প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বের উপযুক্ত করে গড়ে তুলুন যাতে পরবর্তী প্রজন্মকে বিদেশের মাটিতে তাদের শ্রম বিক্রি করতে না হয়। আর কোনো লোককে যাতে তার প্রিয়জন বা আত্মীয়স্বজনের মুখ থেকে বিরহ বেদনার কথা শুনতে না হয়।

নাম ও পূর্ণ ঠিকানা প্রকাশে অনিচ্ছুক
ইটালি থেকে

কল্পনা

– দেওয়ান জালাল উদ্দীন চৌধুরী

ছোটবেলাতে কল্পনার বাড়ির প্রতি আমার বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তাদের বাড়ি ভর্তি ছিল হরতকি, বরই, আমলকিসহ বিভিন্ন ফলের গাছ। প্রায় প্রতিদিনই এসব মজাদার ফলের আকর্ষণে খালের উপরের সাকো অর্থাৎ বাশের তৈরি সরু সেতু পেরিয়ে চলে যেতাম কল্পনাদের বাড়ি। কল্পনাদের বাড়ি ছিল মনবাগানে। মনবাগান নামটির উৎপত্তির পেছনে মন বা হৃদয় ঘটিত কোনো ব্যাপার ছিল না। চারদিকে খালঘেরা বালুময় ওই জায়গায় কাটাওয়ালা এক ধরনের গাছে গোল গোল গুটি ধরতো। এ গুটিগুলোকে স্থানীয় ভাষায় বলা হতো *মনগুটি।* এ মনগুটি থেকে *মনগাছ* আর মনগাছ থেকে ওই জায়গার নাম হয়েছে *মনবাগান।*
কল্পনারা ছিল খুবই গরিব। কিন্তু তাদের পরিষ্কার–পরিচ্ছন্ন উঠান দেখে তা বোঝার উপায় ছিল না। ছিমছাম উঠানের চারপাশে ছিল নানান জাতের ফলমূলের গাছ। সারা বছরই কোনো না কোনো গাছে

ফল ধরে থাকতো। উঠানে সব সময় ছায়া ছায়া-শান্ত-স্নিগ্ধ একটা পরিবেশ বজায় থাকতো। গাছ থেকে পাতা পড়লেই তা পরিষ্কার করে ফেলা হতো। উঠানের এক পাশে ছিল তুলসী গাছ। সেখানে সকাল-দুপুর-সন্ধ্যায় পূজা দেয়া হতো। গোধূলি বেলায় জ্বলতো মঙ্গলপ্রদীপ। সব মিলিয়ে সেখানে বিরাজ করতো একটা পবিত্র ভাব। আজ এতো বছর হয়ে গেছে তবুও স্পষ্ট মনে পড়ে, প্রচণ্ড গরমে অন্য জায়গায় যেখানে গাছের পাতা নড়তো না সেখানে কল্পনাদের উঠানে গাছের পাতাগুলো বাতাসে অদ্ভুত সব শব্দ তৈরি করতো। কল্পনাদের খোলামেলা পরিষ্কার উঠান। তুলসী গাছ, সবুজ গাছের চিক চিক করা পাতা, চারদিকের নিরিবিলি পরিবেশ তাদের বাড়িটাকে কেমন একটা অপার্থিব সৌন্দর্য এনে দিয়েছিল।

কল্পনা ছিল তার পরিবারের একমাত্র সন্তান। বাবা-মাসহ তিন সদস্য বিশিষ্ট এ পরিবারটি কিভাবে চলতো তা জানতাম না। কারণ এ পরিবারের কাউকে, কখনোই কোনো কাজ করতে দেখিনি। কল্পনার বাবাকে বিড়ি টানা ছাড়া আর কোনো কাজ করতে কখনোই দেখিনি। কল্পনা ঝাড়ু দিয়ে সারা দিনই উঠান পরিষ্কার করতো। আর তার মা সারাদিনই ঘুমাতেন। কি কারণে ঠিক জানি না। অবশ্য জানার আগ্রহও ছিল না। আমার সব আগ্রহ ছিল আমলকি, হরতকি, বরই ইত্যাদির প্রতি। আমার কর্মজীবী বাবা-মা বাসায় না থাকার সুযোগে মফস্বলের নির্জন দুপুরটা আমি পুরো পাড়াটা দাবড়ে বেড়াতাম। বেড়ানোর এক পর্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হতাম কল্পনাদের বাড়ি। কল্পনা ছিল বয়সে আমার চেয়ে অনেক বড়। গায়ের রঙ ছিল কালো। শুধু কালো বললে ভুল হয়। একেবারে ভীম কালো। কালো ছাড়াও তার শারীরিক আরেকটা ত্রুটি ছিল। তার নাকটা ছিল ভয়ঙ্করভাবে প্যাচানো। ফলে তাকে দেখলেই ভয় লাগতো। নির্জন দুপুরে গেলে দেখতাম কল্পনা খালের ময়লা পানিতে বাসন ধুচ্ছে। বাবা ঘরের দাওয়ায় বসে কেমন নির্লিপ্তভাবে বিড়ি টানছেন আর মা ঘুমাচ্ছেন। আমাকে দেখেই কল্পনা খেকিয়ে উঠতো, অ্যাই যা ফোট। ফলমূল কিছুই নেই।

জানতাম সে আমাকে নিরাশ করবে না। থালা-বাসন ধুয়ে সে একটা পিতলের পাত্র থেকে আমলকি বা হরতকি কিংবা বাতাবি লেবু দিতো নিঃশব্দে। আর আমিও সেটি পেয়ে বিনা বাক্য ব্যয়ে এক দৌড়ে খাল পেরিয়ে চলে আসতাম স্বার্থপরের মতো।

কল্পনাদের কখনোই কারো সঙ্গে ঝগড়া করতে দেখিনি। তবুও সবাই তাদেরকে এড়িয়ে চলতেন। খারাপ বলতো। ছেলেমেয়েদেরকে মনবাগানে যেতে পাড়ার মা-বাবা নিষেধ করতেন। সবাই বলতো, কল্পনার মা নাকি খারাপ। রাতের বেলা নাকি সে কিসের ব্যবসা করে। আমার অবশ্য কল্পনার মাকে খারাপ লাগতো না। সুন্দর, গোলগাল, সিদুর, পরিপাটি করে পরা লাল শাড়ি, পান খাওয়া লাল ঠোঁট তাকে কেমন একটা মাতৃভাব এনে দিয়েছিল। আমাকে দেখলেই তার চোখে মুখে কেমন একটা মায়া উপচে পড়তো।

কল্পনার বাড়ি থেকে ফল-ফলাদি খেলেও বিকেল বেলা আমরা অন্য রকম ছিলাম। আমাদের অন্যতম খেলা ছিল কল্পনাদের চালে ঢিল দিতাম। কেন দিতাম ঠিক জানি না। তবে বেশ মনে আছে, পাড়ার বড়ভাইদের নেতৃত্বেই আমরা এ কুকাজগুলো করতাম। একবার মনে আছে, ভারতীয় *দূরদর্শনে* তখন *মহাভারত* দেখাচ্ছে। হিন্দু মুসলমান সবাই খুব মনোযোগ দিয়ে *মহাভারত* দেখছে। মহাভারতে দেখলাম কৃষ্ণ ঢিল দিয়ে রাধা আর সখীদের কলসি ভেঙে দিচ্ছে। এ দৃশ্য দেখে আমরা সবাই

অনুপ্রাণিত হলাম। কল্পনা বিকালে খালে কলসি দিয়ে পানি নিতে এলে আমরা কৃষ্ণ হয়ে তার কলসি ভেঙে দিতাম। সে কিছুই বলতো না। ফ্যাল ফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে থাকতো। হয়তো অবাক হতো মানুষের অকৃতজ্ঞতায়।

কল্পনার মাঝে মধ্যে যেন কি হতো। নির্জন দুপুরে গিয়ে দেখতাম সে লাল শাড়ি পরে, লাল রঙ-এর টিপ দিয়ে, চুলগুলো সুন্দরভাবে বেধে আয়না দিয়ে তার চেহারা দেখছে। তখন তাকে আরো বিশ্রী দেখাতো। আমি কাছে গেলেই বলতো, *এ্যাই ছেমড়া আমাকে কি বৌ বৌ লাগতাছে ?* হরতকি, আমলকির আশায় তার কথায় সায় দিতাম। সে খুশি হতো। হরতকি, আমলকির পরিমাণটা সেদিন সে বাড়িয়ে দিতো।

হঠাৎ একদিন সকালে উঠে শুনি কল্পনা শাড়ি পেচিয়ে আত্মহত্যা করেছে। ওই বয়সে আত্মহত্যা কি জিনিস তা জানতাম না। তবুও মুরুব্বিদের নিষেধ উপেক্ষা করে কল্পনার কি হয়েছে দেখতে গিয়েছিলাম। গিয়ে দেখি কল্পনা ঝুলছে গাছের ডালে শাড়ি পেচিয়ে। গলায় সেই লাল শাড়ি, কপালে লাল টিপ, পায়ে আলতা। বড় বড় চোখ করে মা কালীর মতো জিভ বের করে কেমন অদ্ভুত চোখে তাকিয়ে আছে।

কল্পনা আত্মহত্যা করেছে অনেক বছর হলো। তবুও এতো বছর পরও শাড়ি পেচিয়ে হা করে তাকিয়ে থাকা সেই দৃশ্য আজো ভুলতে পারিনি। বড় হয়ে জেনেছি কল্পনার মা রাতের আধারে কিসের ব্যবসা করতো। তার মায়ের কারণেই হোক কিংবা কল্পনার চেহারার কারণেই হোক তার বিয়ে হচ্ছিল না। বয়স যাচ্ছিল বেড়ে। কল্পনা বুঝতে পেরেছিল সে সমাজ ও পরিবারের বোঝায় পরিণত হয়েছে। বোঝা কমানোর জন্যই সে শাড়ি পেচিয়ে আত্মহত্যা করে। দায়মুক্ত করে দিয়ে যায় পরিবারকে এবং সমাজকে।

ঢাকা থেকে

সংসার

– যাবের চৌধুরী

লোপা হয়তো কোনোদিনই জানবে না। আসলে মনে-প্রাণে চেয়েছিলাম আজকের দিনটি অন্য রকম হোক। যেমন সে জানে না উদাসীনতার আড়াল থেকে ঠিকই দেখি লোপার পরনের জীর্ণ হয়ে আসা শাড়ি, ডাইনিং টেবিলের ক্রমেই ছিড়ে যাওয়া ক্লথ অথবা ধার করা কাপে অতিথি বিদায়ের মতো ঘটনাগুলো। কিন্তু সব দেখেও না দেখার ভান করা ছাড়া কিইবা করার আছে আমার। যার হাতেগোনা বেতনে বাড়ি ভাড়া এবং ছেলেমেয়ের পড়াশোনার খরচ যোগাতেই সব ফুরিয়ে যায়। তারপরও এসব বলে নিজেকে প্রবোধ দেয়া যায় না। ভাবলাম এবার বাড়িতে ইনক্রিমেন্টের টাকাটা দিয়ে লোপার জন্য একটা ভালো শাড়ি কিনবো।

আজ ছিল লোপাকে সারপ্রাইজ দেয়ার দিন। বেইলি রোড থেকে সাধ্যমতো দামি শাড়ি আর কিছু ফুল কিনলাম। কিন্তু রিকশাযোগে বাড়ি ফেরার পথে ঘটলো বিপত্তি। দুই মুখোশবিহীন অস্ত্রধারী, পকেটের অবশিষ্ট টাকা, ঘড়িসহ শাড়িখানা ভদ্রভাবে চেয়ে নিল। বিনিময়ে বিশটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে বললো, এদিক-সেদিন না তাকিয়ে সোজা বাড়ি চলে যান।

গোবেচারার মতো খালি হাত আর শূন্য হৃদয়ে বাড়ি ফিরলাম। ফুলগুলো ফেলে দিয়ে এলাম আসার পথে এসব কথা লোপাকে আর বলা হলো না। না ফুলের কথা, না শাড়ির কথা। প্রতিদিনের মতো ঢাল হিসেবে চোখের সামনে খবরের কাগজ মেলে ধরলাম। এবং আড়চোখে জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা সংসার সমুদ্রের আছড়ে পড়া ঢেউ গুণে যেতে লাগলাম।

পূর্ণ ঠিকানাবিহীন
মোহাম্মপুর, ঢাকা থেকে

ওরা

– আবু ইসমাইল

আশ্চর্য ব্যাপার! দুই মাসে দাম শোধ করার চুক্তিতে শাড়িটা আনলাম। অথচ মাত্র দুই দিন পরার পর আর শাহানার পরনে সে শাড়িটা দেখছি না। কোথাও দেখছি না। আগে যে ছেড়া শাড়িটা পরছিল, এখনো সেটাই পরছে।

শাড়িটার কথা তুললেই শাহানা নির্বাক থাকে। অদ্ভুত একটা হাসি হাসে। তাকে অপরাধীর হাসিও বলা যায় আবার রহস্যময় হাসি বলেও ধরা যায়।

প্রতিবেশীদের ছাদ, বারান্দা থেকে অনেক শাড়ি, চাদর চুরি হয়েছে। কিন্তু আজ পর্যন্ত আমার বাসায় এ রকম কোনো ঘটনা ঘটেনি। শাড়িটা চুরি হয়েছে কি না জিজ্ঞাসা করলে সে সংক্ষেপে জবাব দেয়, না। না তো ওটা গেল কোথায়? উত্তর মিলে না।

জোর দিয়ে বলি, ওটা চুরি হয়েছে এবং ঠিকা কাজের বেটি জয়গুনই চুরি করেছে। শাহানা শান্ত গলায় আমাকে উপদেশ দেয়, সন্দেহবশত কাউকে চোর বললে পাপ হয়। যা বাবা! একেই বলে নিজের ধনে নিজেই চোর।

ডিসেম্বর মাস। ছাত্রছাত্রীদের বার্ষিক পরীক্ষা শেষ। স্কুল ছুটি। পদ্মা আবাসিক এলাকায় এক বাল্যবন্ধুর বাড়ি বেড়াতে গেলাম। পরস্পর বিস্তর তুই-তোকারি, শালা-সম্বন্ধী, চোর-বদমায়েশ ইত্যাকার শ্রুতিমধুর গালিগালাজ বিনিময় শেষে নাশতা খেয়ে বাসার দিকে রওনা দিলাম।

দুই মাইল রাস্তা। রিকশা ডাকলাম না। শীতের দুপুর। মিঠে রোদে হাটতে মন্দ লাগছিল না। বনগায়ে বুয়ার বাড়ির পাশ দিয়ে আসছি। বাড়ি তো বলা যায় না, ছনের বেড়ায় ঘেরা ছোট্ট একটা ঘর। উপরে বাশের খুটির ওপর রিলিফের এক বান্ডল ঢেউ টিন। বাশ-ছন কেনার টাকাটা আমাকেই দিতে হয়েছিল। ওই ঘরেই শোয়া, খাওয়া। স্বামী নেই, সেই কবে একটা মেয়ে কোলে দিয়ে লাপাত্তা হয়েছে। মেয়েটার নাম হাজেরা। সংসারে জয়গুনের আর কেউ নেই।

বুয়ার ঘরের দিকে তাকাতেই নজরে পড়লো উঠানে বাশের ওপর রোদে শুকাতে দেয়া একটা নতুন শাড়ি। দুই পা আগালাম। ঠাহর করে দেখতে লাগলাম। হ্যা এটা তো ওই শাড়িই। ভেজা শাড়িটার এক প্রান্ত বাশের ওপরে, অন্য প্রান্ত বুয়ার মেয়ে হাজেরার পরনে।

হঠাৎ নজর গিয়ে পড়লো, ষোল সতেরো বছরের মেয়েটার উদাম বুকের ওপর। কথায় বলে তেলে–জলে সুন্দরী। মেয়েটা তেল–জল পায় না। তাই হয়তো সুন্দরী বলা চলে না। কিন্তু তার সুডৌল দেহ অনেকেরই নজর কাড়ার মতো।

হাজেরা আমার উপস্থিতি টের পেল। লজ্জায় দুই হাত বুকের ওপর ক্রস করে ফেটে পড়া ফর্শা বুকটাকে ঢাকার বৃথা চেষ্টা করলো। নিমেষেই নজর ঘুরিয়ে বাসার দিকে পা বাড়ালাম।

মাটিতে পা পড়ছে কি না বুঝতে পারছি না। চোখে শুধু দেখছি সেই অপরূপ দৃশ্য। অনেক দিন আগে যে দৃশ্য হারিয়ে গেছে আমার চোখের সামনে থেকে।

মোহ ঘোর কাটতে দুইদিন লাগলো। জয়গুন কাজ করে চলে গেছে। বাড়িতে শুধু শাহানা আর আমি। শাহানাকে কাছে পেয়ে বললাম, শাড়ির ব্যাপারে বুয়াকে সন্দেহ করে পাপ করিনি।

আবার সেই কথা? শোনো, শাড়িটা জয়গুন চুরি করেনি।

তাহলে জয়গুনের বাড়িতে ওটা গেল কি করে?

তুমি জয়গুনের বাড়ি গিয়েছিলে শাড়ি চোর ধরতে? ছিঃ! এতো ছোট মন তোমার?

শাহানা আমার দিক থেকে মুখ ঘুরিয়ে নিল। দুজনে নীরবে বসে থাকলাম। শাহানা কি ভাবছে জানি না, আমি ভাবছি হাজেরার কথা।

এক সময় শাহানা আমার কাছ ঘেষে বসে ধরা গলায় বলতে লাগলো শোনো, সেদিন সকালে কাজে আসতে জয়গুন খুব দেরি করেছিল। তাকে কারণ জিজ্ঞাসা করতেই সে কাদতে কাদতে বললো, খালাম্মা, গত ঈদে আপনি আমাকে এই শাড়িটা দিয়েছিলেন। এ একটা শাড়িই আমাদের মা মেয়ের একমাত্র পরনের কাপড়। আমি যখন কাজে আসি তখন ঘরের মধ্যে হাজেরা আটকা থাকে। আবার হাজেরা যখন বাইরে যায় তখন আমাকে ঘরের মধ্যে থাকতে হয়। হাজেরা একটা বাড়িতে খুব সকালে কাজ করে। আজ সে কাজ করে আসতে দেরি করেছে। তাই আসতে দেরি হয়েছে।

জয়গুনের কথা শুনে তাকে শাড়িটা দিয়ে দিয়েছি। যেমন করে হোক, আমার কয়টা মাস চলে যাবে। তোমার অভাবের কথা চিন্তা করে এতো তাড়াতাড়ি কথাটা বলতে সাহস পাচ্ছিলাম না। জানি, ব্যাপারটা জানলে তুমি আমাকে কিছুই বলবে না।

সত্যিই বেসরকারি হাই স্কুলে শিক্ষকতা করে দুটো ছেলের লেখাপড়ার খরচ জোগাতে আমার *নুন আনতে পান্তা ফুরায়* অবস্থা। এর মধ্যে একটা শাড়ি আসলে অনেক বড় ব্যাপার। কিন্তু আমি ভাবছিলাম অন্য কথা।

সেদিন ওই পরিবেশে আমি না হয়ে যদি কুড়ি পচিশ বছরের একটা যুবক হতো তাহলে হাজেরার জীবনে হয়তো অভিশপ্ত একটা ঘটনা ঘটে যেতো। মানসম্মান অথবা কলঙ্কের ভয়ে জয়গুন–হাজেরা মুখ খুলতো না কিংবা সমাজের দশজনের কাছে বিচারের জন্য মাথা ঠুকে মরতো। তাতে হাজেরার জীবনই বিপর্যস্ত হতো, নরপশুটার কিছুই হতো না। খবরের কাগজে একটা পুরনো কাহিনী নতুনভাবে আসতো, ফাকতালে কাগজওয়ালাদের কিছু টাকা বাড়তি আয় হতো।

উপশহর, রাজশাহী থেকে

ঢাকাই মসলিন

– ডা. রুমী আলম

যখন বারডেম হাসপাতালে কাজ করতাম তখন পুরনো ঢাকার এক রোগিণী সঙ্গে আমাদের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ডায়াবেটিস জনিত জটিলতায় তিনি প্রায়ই ভর্তি হতেন। হৃদরোগ বিভাগসহ বেশ কয়েকটি বিভাগের স্যাররা ওনাকে খুব শ্রদ্ধার সঙ্গে দেখতেন।

পুরনো ঢাকার এক বনেদী পরিবারে ওনার জন্ম। পরবর্তী কালে ঢাকার এক সময়কার নামকরা কমিশনার আল্লা বক্স–এর পুত্রবধূ হন।

ওনার সংগ্রহে একখানা ঢাকাই মসলিন শাড়ি ছিল। ১৯৩০ সালের দিকে ডেমরা এলাকা থেকে এটি সংগৃহীত হয়। ২০০১ সালের প্রথম দিকে মৃত্যুর কয়েক মাস আগে তিনি এটি ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে দান করেন। এখন পর্যন্ত পাওয়া বাংলাদেশের একমাত্র ঢাকাই মসলিন শাড়িটি বর্তমানে জাদুঘরে প্রদর্শিত হচ্ছে। শাড়িটিতে মসলিন শাড়ির যাবতীয় বৈশিষ্ট বিদ্যমান। একটি আংটির ভেতর দিয়ে এটিকে চালিয়ে নেয়া যায়।

এই স্বনামখ্যাত দানশীল, জাদুঘর সুহৃদ হিসেবে খ্যাত ভদ্রমহিলার নাম জাহানারা খাতুন। তিনি এক কন্যা ও পাচ ছেলে রেখে গেছেন। এক ছেলে বর্তমানে জাদুঘরের পদস্থ কর্মকর্তা। আমাকে তিনি নিজের ছেলের মতোই দেখতেন। যেহেতু আমার মা বেশ আগেই গত হয়েছেন সেহেতু আমিও তার স্নেহের কাঙাল ছিলাম।

পুরনো ঢাকার বংশাল পারিবারিক কবরস্থানে তিনি চিরনিদ্রায় শায়িত। ওনাদের নিয়ম অনুযায়ী কবরের কোনো চিহ্ন রাখা হয় না। চিহ্ন না থাক, তবু ওনার স্মৃতি তো আবহমান বাংলার ঐতিহ্যের স্মারক হিসেবে যুগ যুগ ধরে বেচে থাকবে।

আখাউড়া, ব্রাহ্মণবাড়িয়া থেকে

শেষ শাড়ি

– সামিমা

বছর দুই আগের কথা। ঈদ সামনে আমার এক বান্ধবীর বাসায় বসে কথা হচ্ছিল, এবার ঈদে কে কি কেনাকাটা করবে এবং শাড়ি কেমন হবে। মাঝখান থেকে তার ছেলে এসে বললো, এবারে ঈদে তোমরা কাফনের কাপড় কিনে রাখলে কেমন হয়?

আমি তো বাকহারা। সে তো সত্যি কথাই বলেছে যেটা আমার–তোমার সঙ্গে থাকবে। এখন প্রায়ই ভাবী বলেন, আমার *কাফন শাড়ি* হারাবেন না। ওটা আমার কবরের সঙ্গে নিয়ে যাবো।

খিলগাও, ঢাকা থেকে

উপলব্ধি

– ইয়াসমিন মুহসীন

রিকশায় উঠে এরই মধ্যে আমার স্বামী কমপক্ষে তিনবার বলেছে, ইশ! টাকাটা অযথাই খরচ হলো, টাকাটা বেকার নষ্ট হলো।

এই টাকার পরিমাণটা হচ্ছে দুইশ ষাট টাকা। আর টাকাটা নষ্ট হয়েছে আমাকে কিনে দেয়া একটা প্রাইড শাড়ির পেছনে যে শাড়িটা ছিল বিয়ের প্রায় ছয় মাসের মধ্যে আমাকে আমার স্বামীর কিনে দেয়া প্রথম শাড়ি। সেদিন তার ওসব কথায় যে কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছিলাম, লজ্জা পেয়েছিলাম তা কেবল আমিই জানি।

আজ থেকে তিন বছর আগের ঘটনা এটা। আমাদের বিয়েটা হয়েছিল অ্যাফেয়ার ম্যারেজ আর অ্যারেঞ্জ ম্যারেজের মাঝামাঝি পর্যায়ের, একটু অন্য রকম। বিয়ে পরবর্তী অনেক জটিলতার কারণে শ্বশুর বাড়ি যেতে আমার অনেক দেরি হয়েছিল। আমার স্বামীর তখন একমাত্র উপার্জনক্ষম যোগ্য সন্তান হিসেবে বাবা-মাকে তুষ্ট করা, যোগ্য স্বামী এবং নতুন চাকরির জন্য যোগ্য অনুগত কর্মচারীর দায়িত্ব পালন করতে প্রাণান্তকর অবস্থা। এতোসবের সঙ্গে আরো আছে সদ্য অ্যাডমিশন নেয়া এমবিএ-র নাইট শিফটের ক্লাস এবং পড়াশোনা। আমিও তখন মাত্র ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হওয়া উচ্ছল, প্রাণবন্ত, কল্পনাপ্রবণ সদ্য বিবাহিতা এমন একটি মেয়ে যে শুধু স্বামীর সঙ্গে একটার পর একটা রোমান্টিক দৃশ্যের কল্পনা করেই দিনের অধিকাংশ সময় কাটিয়ে দেয়। স্বামীর মানসিক বা আর্থিক কোনো অবস্থাই বুঝতে চাইতাম না। অন্যদিকে আমার স্বামী প্রথম থেকেই ভীষণ চাপা স্বভাবের মানুষ। মনের অবস্থার কথা কিছুই বলতো না। এতোটুকু সমস্যার কথাও না। এমনকি কতো টাকা বেতন হতো তাও না। এ ব্যাপারটা কিছুতেই মেনে নিতে পারতাম না। কেবলই মনে হতো, আমার স্বামী আমাকে নিশ্চয়ই খুব লোভী এবং ছোট মনের ভাবে তাই বেতনের কথা বলে না।

মাত্র সাড়ে ছয় হাজার টাকা বেতনের চাকরিতে সে জয়েন করেছে। এখন বেশ বুঝি সেই সময় লজ্জায় আমাকে এ কথাটা আমার স্বামী বলতে পারেনি। বিয়ের পর স্ত্রীকে নিজের সীমাবদ্ধতার কথা জানালে কোনো স্ত্রীই তার স্বামীকে অবহেলা বা লজ্জিত করে না এটা আমার বিশ্বাস। তার পরিবর্তে বরং স্বামীর সীমাবদ্ধতা, স্বামীর কষ্টকে নিজের সীমাবদ্ধতা, নিজের কষ্ট মনে করে দুজনে পরিকল্পনা করে সুন্দরভাবে সংসার চালানো যায় যদি একের প্রতি অন্যের প্রকৃত ভালোবাসা থাকে। আমার স্বামী এটা করেনি বলে অনেক সময় আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধবের উপহাসে অতিষ্ঠ হয়ে অনেক কটু কথা বলে ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। আত্মীয়া স্থানীয় বড়-ছোট অনেকেই যখন জিজ্ঞাসা করতো, তোমাকে মুহসীন কি কি কিনে দিয়েছে দেখি, তখন আমি তাদেরকে কিছুই দেখাতে পারতাম না বলে লজ্জায় মরে যেতাম। লজ্জা দিয়েই তারা ক্ষান্ত হতো না। আমাকে আরো কাছে বসিয়ে চুপি চুপি জিজ্ঞাসা করতো, তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করে, আদর-আহ্লাদ করে তো!

তাদের সামনে কোনো রকম নিজেকে সামলে নিয়ে কথা বলতাম। সবাই চলে গেলে শুধু দুঃখ-কষ্টে আমার দুই চোখ আপনা থেকেই পানিতে ভরে উঠতো। কানে শুধু তাদের কথাগুলোই বাজতো তোমার কপালটা যে কেন এমন হলো জানি না বাপু। এটা কেমন কথা, বিয়ে হয়েছে এতোদিন হলো

এখনো একটা শাড়িও কিনে দিল না, দুটা চুড়িও কিনে দেয়ার কি ওর টাকা নেই। একটা রিকশাচালকও তো তার নতুন বৌকে নিয়ে কতো শখ-আহ্লাদ করে। এসব নানানজনের নানান কথা শুনতে শুনতে এক সময় আমারও মনে হতে লাগলো সত্যিই হয়তো আমার স্বামী আমাকে একদম ভালোবাসে না। রাত-দিন এ জন্য আমার স্বামীকে অনেক কটু কথা বলেছি জ্বালায়েছি কান্নাকাটি করে ওকে অনেক কষ্ট দিয়েছি। ভুল করেছি।

আমার পড়াশোনা এখন শেষ পর্যায়ে, আমার স্বামীর পড়াশোনাও শেষ হয়েছে। পদোন্নতিও হয়েছে, আগের চেয়ে তিনগুণেরও বেশি টাকা বেতন পাচ্ছে। বাবা-মাও আজ খুশি, সবাইকে যথেষ্ট সাহায্য করে। মনের সব কথাই আমাকে খুলে বলে। এখন আমরা দুজন দুজনকে অনুভব করি, একে অন্যকে বুঝতে পারি। দুজন দুজনকে না দেখে স্বস্তি পাই না, ছেড়ে থাকতে পারি না একদিনও। আগের কথাগুলো মনে হলে ভীষণ লজ্জা পাই। নিজেকে অপরাধী মনে হয়, বিশেষ করে আমার স্বামী যখন আমাকে নতুন কোনো ড্রেস কিনে দেয় তখন অপরাধ বোধটা আরো বেশি কাজ করে।

নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় সকল বিবাহিত পাঠককে একটা কথা বলতে চাই, আপনার বিয়ের বয়স যদি মাত্র একদিনও হয় এই মুহূর্ত থেকে সিদ্ধান্ত দিন নিজের প্রিয় মানুষটিকে মনের সব কথাই বলবেন, নিজের সম্পর্কে একে অপরকে বুঝতে সহায়তা করবেন। সত্যিকারের ভালোবাসা থাকলে একজনের সীমাবদ্ধতাটুকু অন্যজনের সহানুভূতিতে আলোকিত হয়ে উঠবে।

আর একটা কথা। আমাকে কিনে দেয়া আমার স্বামীর সেই প্রথম শাড়িটা ব্যবহার করতে পারিনি। হাতে আর একটা শাড়ি কেনার মতো বাড়তি টাকা না থাকায় ওই শাড়িটাই আমার এক ননদকে দিতে হয়েছিল স্বামীর কথামতো। সে সময় প্রথম শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলাম। যদিও শাড়িটার দাম মাত্র দুইশ টাকা তবুও সেদিন ভীষণ মনঃকষ্টে ভুগেছিলাম। কারণ স্বামীর দেয়া প্রথম শাড়ি হিসেবে সেটার দাম ছিল আমার কাছে অনেক বেশি।

পূর্ব কাজীপাড়া, মিরপুর, ঢাকা থেকে

এমপি সাহেবের লিস্ট

– তানজীর আহমেদ

১৯৯৭ সালের ঈদুল ফিতরের সময়ের ঘটনা। এমপি সাহেব এলাকায় যাকাতের শাড়ি দেবেন এই কথাটা কিভাবে যেন গ্রামে প্রচার হয়ে গেল। তারপর থেকেই আমার বাড়িতে গরিব মহিলাদের যাতায়াত শুরু হতে লাগলো। এমপি সাহেবের ঘনিষ্ঠজন হিসেবে এলাকায় আগেই পরিচিত ছিলাম। তাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম, শাড়ি এলেই সবাইকে খবর দেয়া হবে। এমপি সাহেবের কথা মতো গরিব মহিলাদের নামের তালিকা জমা দিলাম।

নির্দিষ্ট দিনে শাড়ি আনতে গিয়ে জানলাম আমাদের গ্রামের জন্য দুইশ সাতান্ন জনের তালিকা থেকে মাত্র ষোলটি শাড়ি বরাদ্দ করা হয়েছে। এতো কম শাড়ির কথা শুনেই মাথা ঘুরতে লাগলো কিভাবে এতো লোককে বোঝাবো। সকলের করুণ আর্তি আমার চোখের সামনে ভেসে উঠলো। কতোজন যে পরনের শাড়ি ছেড়া তালি দেয়া অংশগুলো আমাকে দেখিয়েছে তাদের আমি কি বলবো? সই করে

শাড়ি আনতে গিয়ে জানলাম আমার নামে সই করে অন্য গ্রামের এক প্রভাবশালী নেতা শাড়িগুলো নিয়ে গেছেন এবং আমাকে তার সঙ্গে দেখা করতে বলে গেছেন। আমি নেতার সঙ্গে দেখা করার পর তিনি আমাকে নয়টি শাড়ি দিয়ে বললেন, বাকি সাতটি শাড়ি তার এক নিজস্ব কর্মীকে দিয়ে দিয়েছেন। আমি বললাম, আমার গ্রামের মহিলাদেরকে কিভাবে বোঝাবো?

এ কথা শুনেই তিনি রেগে গেলেন। বললেন, দেখো তানজীর আমি রাজনীতি করি আজ পচিশ বছর। তোমার বয়সের চেয়েও বেশি। গরিবদের যতো দেবে ততোই চাইবে। তুমি পাচশ শাড়ি নিয়েও সবার মন ভরাতে পারবে না। সুতরাং এই নয়টির মধ্যে তুমি দুটি শাড়ি রেখে বাকি সাতটি শাড়ি গরিব মহিলাদের মধ্যে বিলিয়ে দাও।

বললাম, কি বলছেন আপনি এসব?

এবার সরাসরি নেতা বলে উঠলেন, না নিলে ফেলে চলে যাও।

ছেড়া শাড়ি পরা মহিলাদের কাতর চাহনির কথা মনে করে নয়টি শাড়ি নিয়েই গ্রামে এলাম এবং চুপি চুপি নয়জনকে নয়টি শাড়ি দিয়ে দিলাম। হায়রে শাড়ি! যাদের ঈদের দিনে খাবার জোটানোর নিশ্চয়তা নেই সেই মানুষেরা কি না শাড়ি পেয়েই ঈদ উৎসবে মেতে উঠেছে।

ঈদের দিন। সকাল থেকেই মহিলারা আসছে। কারণ ইতিমধ্যেই শাড়ি পাওয়া মহিলাদের কাছ থেকে শাড়ি আসার খবর সবাই জেনে গেছে। একটা শাড়ি পাবার জন্য সে কি আকুতি! অনেক মহিলার ভিড় জমে গেছে। কি বলবো তাদের? কোথা থেকে দেবো শাড়ি! আমি যে অতি ক্ষুদ্র মানব।

মুরাদনগর, কুমিল্লা থেকে

নির্মম

–আমিনুর রহমান রুবেল

কেয়া ও তনু আমার মামাতো বোন। বরিশাল শহরে মামার বাসা। মফস্বলের একটি কলেজ থেকে এইচএসসি পাস করে বরিশাল বিএম কলেজে অনার্সে ভর্তি হলাম পদার্থবিদ্যা বিষয় নিয়ে। মামার বাসায় থেকেই লেখাপড়া করছি। লেখাপড়ায় একটু ভালো ছিলাম বলে মামা–মামি আমাকে খুবই আদর করতেন। কেয়া, তনুও কম পছন্দ করতো না আমাকে। কেয়া বড়,পড়তো ক্লাস নাইনে। তনু ছোট, পড়তো ক্লাস এইটে।

বাসায় লেখাপড়ার ফাকে কেয়া, তনুর সঙ্গে গল্প–গুজব করেই আমার সময় কাটতো। তারা সব সময় আমার পেছনে জোকের মতো লেগে থাকতো। মাঝে মধ্যে তাদেরকে বেড়াতে নিয়ে যেতাম, তারাও আমার সঙ্গে বেড়াতে খুব স্বাচ্ছন্দ বোধ করতো। ক্রমেই তাদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক ঘনিষ্ঠ থেকে ঘনিষ্ঠতর হতে লাগলো।

একবার এক সড়ক দুর্ঘটনায় মামার পা ভেঙে গেল। মামাকে ক্লিনিকে ভর্তি করা হলো। ভাঙা পা নিয়ে মামাকে কয়েক মাস ক্লিনিকে কাটাতে হলো। মামাকে সেবা–যত্নের জন্য মামিকে সর্বক্ষণ ক্লিনিকে থাকতে হতো। সারাদিন ক্লিনিকে থেকে রাতে বাসায় ফিরতাম।

একদিন বাসায় ফিরতে আমার প্রায় রাত এগারোটা বেজে গেল। দরজা নক করতেই কেয়া এসে দরজা খুলে দিল। ক্লান্ত শরীরে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম কেয়ার দিকে। আজ কেয়াকে খুবই সুন্দর লাগছে। মামা ক্লিনিকে অসুস্থ। তাই কেয়ার মনটা ইদানীং ভালো যাচ্ছিল না। কিন্তু আজকে ওকে খুবই ফ্রেশ মনে হচ্ছে। দাড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, আজ কেয়াকে এতো সুন্দর লাগছে কেন? একটা সুন্দর নীল রঙের শাড়ি পরেছে আজ। আগে কখনো এভাবে শাড়ি পরা অবস্থায় কেয়াকে দেখিনি। শাড়ি পরলে কেয়াকে এতোটা চমৎকার লাগে কল্পনাও করিনি। কপালে পরেছে শাড়ির সঙ্গে ম্যাচ করা ছোট নীল টিপ। ঠোটে লিপস্টিক। চোখে আইলাইনার। অবাক হয়ে দাড়িয়ে কেয়ার দিকেই তাকিয়ে রইলাম।

কি! ভেতরে আসছো না যে? কেয়া বললো।

ও তাই তো। আমি ঘরে ঢুকলাম।

বাসায় আমি, কেয়া ও কেয়ার বুড়ো নানি, নানি কয়দিন আগে এসেছেন মামার পা ভাঙার খবর শুনে। তনুকে এক ফুপুবাড়ি পাঠানো হয়েছে বেশ কিছুদিন আগে। রাত বারোটা পর্যন্ত কেয়া আর আমি টিভি দেখলাম। রিমোট হাতে বিভিন্ন চ্যানেল ঘুরে বেড়াচ্ছি। ততোক্ষণে নানি ঘুমে অচেতন। আমি শুতে এলাম। কিছুক্ষণ পর কেয়া এলো মশারি টানিয়ে দিতে। কেয়ার সঙ্গে আবার গল্প করা শুরু হলো। দুজন পাশাপাশি বসে নানান কথা বলে যাচ্ছি। সারাদিনের অনেক পরিশ্রমের পর চোখে আমার অনেক ঘুম। তবুও কেয়াকে চলে যেতে বলতে ইচ্ছে হয় না। কেয়া এখনো শাড়িটাই পরে আছে।

রাতটা এখন আরো গভীর হয়েছে। চারদিকে চুপচাপ যেন পৃথিবীর সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে ওই বুড়ো নানির মতোই। শুধু কেয়া আর আমি জেগে আছি। ততোক্ষণে আমার বুকে সমুদ্রের ঢেউ। চোখে পলক পড়ছে না। এই মুহূর্তে আমার কাছে কেয়াকেই মনে হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম সুন্দরী যেন স্রষ্টার অপরূপ মহান সৃষ্টি সে। বুকটা কেমন যেন ধড়ফড় করতে লাগলো আমার। কেয়ার হাতটা ধরে তখনো বসে আছি। একটু জড়িয়ে ধরতেই আমাকে একটি আগ্রাসী চুমু দিল কেয়া।

আমিও পাল্টা জবাব দিলাম। চুমুতে চুমুতে তার সমস্ত মুখ লাল হয়ে যাচ্ছে। আমার সমস্ত শরীর থর থর করে কাপছে। হঠাৎ ওই সুন্দর নীল শাড়ির আচলের নিচ দিয়ে তার বুকের ওপর আমার হাত দুটো চলে যায়। কেয়াও সাদরে বরণ করে নেয় সৌভাগ্যময় এ দুটো হাত। আমি তার চোখে তাকাই।

আমার যেন কেমন লাগছে। প্লিজ, একটু আদর করো না আমায়। বললো কেয়া।

আমি কি করবো ভেবে পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ আমিও যেন কেমন হয়ে গেলাম। আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাস ঘন হয়ে এলো। এক সময় কেয়ার পরনের শাড়িটা খুলে গেল। যে শাড়িটার জন্য কিছুক্ষণ আগেও কেয়ার দিকে অপলক দৃষ্টিতে চেয়ে থাকতাম সেই শাড়িটা এখন বড়ই অপ্রয়োজনীয় মনে হলো। আবারও কেয়ার চোখে তাকাই।

ব্লাউজটা খুলে নিতে পারো না? বললো কেয়া।

আমি একেবারে বোকা হয়ে গেলাম।

কেয়া আবার বললো, তোমাকে দিয়ে কিছুই হবে না।

কেন?

জিজ্ঞাসা করতেই কেয়া বললো, ব্রা-টা কে খুলবে শুনি?

এতোক্ষণে আমার সামনে আবিষ্কার হলো পৃথিবীর একমাত্র মহা আশ্চার্যের জিনিস, চোখের সামনে জ্বলজ্যান্ত এক পরিপূর্ণ নারী। কতোদিনের চেনা কেয়াকে আজ সম্পূর্ণ নতুন রূপে আবিষ্কার করলাম। গর্বে বুকটা ভরে গেল আমার। হাতের নাগালে এই মহা মূল্যবান সম্পদ এতোদিন অনাবিষ্কৃত ছিল ভাবতেই পারি না। কতো কবি কতোশ কবিতা লিখেছেন নারীদের অপরূপ সৌন্দর্য নিয়ে। নগ্নতার রূপ নিয়ে শিল্পীরা ছবি আকেন মনের মাধুরী মিশিয়ে। আমিও স্রষ্টাকে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে নিলাম জীবনের সবচেয়ে আনন্দময় ও শ্রেষ্ঠতম প্রাপ্তিটা এতো সহজে অর্জন করার জন্য।

সময় এগিয়ে যেতে থাকে। কেয়া ও আমার মধ্যে কঠিন প্রেমের সূচনা হলো। আমরা একে অপরকে ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারি না। মাঝে মধ্যে আমরা দুজন বাইরেও বেড়াতে যেতাম। নববর্ষ, ঈদ, জন্মদিন ও ভ্যালেন্টাইনস ডে উপলক্ষে উপহার বিনিময় করতাম। কেয়াকে নিয়ে নানান স্বপ্ন দেখতাম। কেয়াকে বিয়ে করবো, দুজনে ছোট সুখের সংসার সাজাবো চিন্তা করতাম। কেয়াকে মাঝে মধ্যে বলতাম, আমার লুকোচুরি একদম ভালো লাগে না। চলো বিয়েটা করেই ফেলি।

কেয়া বলতো, এতো তাড়াহুড়া করো না সাহেব। সবে তো শুরু। আগে লেখাপড়া কমপ্লিট করো, তারপর বিয়ে। তাছাড়া তোমাকে তো আমি যখন যা চাচ্ছো তাই দিচ্ছি।

ইতিমধ্যে কেয়ার বাবা-মা আমাদের লুকোচুরি জেনে গেল। আমি অনার্স কমপ্লিট করে মাস্টার্স করছি। কেয়াও এইচএসসি পাস করেছে। কেয়ার মা একদিন আমাকে কাছে ডেকে নিয়ে বললেন, তোমাদের সম্পর্কের কথা আমি সব জানি।

মনে মনে ভীষণ খুশি হলাম।

তারপর তিনি বললেন, দেখো, কল্পনার আবেগে জড়িয়ে আকাশের চাদকেও কেউ কেউ হাতের কাছে পেতে চায়। কিন্তু পায় না। কারণ বাস্তবতা বড়ই নির্মম।

বাকরুদ্ধ হয়ে গেলাম যেন সমস্ত আকাশটা ভেঙে পড়েছে আমার মাথার ওপর। কাপা কাপা কণ্ঠে তবুও বললাম, আমরা দুজন দুজনাকে ভালোবাসি।

তিনি জবাব দিলেন, তুমি বেকার। ব্যবসায়ী রহমান সাহেবের ছেলের সঙ্গে কেয়ার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে।

আমি নির্বাক হয়ে রইলাম। ভাবলাম এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে নির্মল, স্বচ্ছ ও পবিত্র ভালোবাসার কোনো মূল্যই নেই। পারলাম না পবিত্র ভালোবাসা দিয়ে কেয়াকে ধরে রাখতে। আমি যখন কেয়ার স্বপ্নে বিভোর তখন কেয়া কি ভুলে যাবে এই আমাকে? ভুলতে পারবে আমার ভালোবাসাকে!

কেয়ার বিয়ে হয়ে গেল। লাল বেনারসি শাড়ি পরে কেয়া চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। চার বছরের স্মৃতি আর বেদনা নিয়ে চলে গেলাম ভালোবাসার স্বর্গ থেকে।

একটি কমপিউটার ফার্মে আমার চাকরি হলো। বেশ ভালোই কেটে যাচ্ছে দিনগুলো। কিন্তু রাতগুলো যায় আমার বড় কষ্টে। ভাবতে থাকি, কেয়া একদিন কতো আপন ছিল আমার। কতো কাছে নিয়ে আমাকে বুকে জড়িয়ে শুয়ে থাকতো কেয়া। আজ সেই কেয়া কতো দূরে। দুচোখ দিয়ে শুধু পানি গড়িয়ে যায় আমার।

কয়েকদিন আগে হঠাৎ কেয়ার সঙ্গে দেখা হয় মার্কেটে। কিছু কেনাকাটা করতে এসেছে। বিয়ের পর এই প্রথম দেখা কেয়ার সঙ্গে। আজো কেয়া পরে এসেছে সেই নীল শাড়িটা। আমার বুকের চাপা যন্ত্রণাটা আবার বেড়ে গেল। এই নীল শাড়ি পরা কেয়াকে দেখেই একদিন পাগল হয়ে গিয়েছিলাম। প্রথম বুকে জড়িয়ে নিয়েছিলাম। ভালোবেসেছিলাম কেয়াকে। আজো সেই একই নীল শাড়ি। একই কেয়া। কিন্তু জড়িয়ে ধরে বুকে নিতে পারছি না। কেয়াকে *রয়াল রেস্তোরার* চা খেতে অফার করলাম। কেয়া রাজি হলো। চা খেতে খেতে অনেক কথাই হলো। জানতে চাইলাম, কেয়া কেমন আছো? তুমি কি সত্যি সুখী হয়েছো? তোমার শ্বশুর তো নামি-দামি বড় ব্যবসায়ী।
কেয়ার দুচোখ জড়িয়ে শুধু অশ্রু জড়িয়ে পড়লো। পরে জানলাম, কেয়ার স্বামী বড়লোক বাবার বখাটে এক ছেলে। পাড়ায় সন্ত্রাসী-মাস্তানি করে বেড়ায়। নেশা-টেশাও করে নিয়মিত। ঘরে নতুন বৌ-এর প্রতি তার কোনো আগ্রহ নেই। এ কথা শোনার পর মামির কথাই মনে পড়ে গেল। বাস্তবতা বড়ই নির্মম।

বরিশাল থেকে

বুদ্ধিমতী

–পলি নাসরিন

বাড়িওয়ালার ছেলের বিয়ে। এই উপলক্ষে পাশের ফ্ল্যাটের ভাবী, বাড়িওয়ালার অন্য সব ছেলের বৌয়েরা, মেয়েরা সবাই নতুন শাড়ি কিনছে। এখানে বলা দরকার, তাদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কটা একই পরিবারের সদস্যদের মতো। রাতে ঘুমুতে গিয়ে ওকে বললাম সবার নতুন শাড়ি কেনার কথা। কোনো উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুয়ে পড়লো। একটু পরেই নাক ডাকার শব্দ পেলাম। দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে আমিও ঘুমিয়ে পড়লাম।
দ্বিতীয় দিন আবারো সেই একই সময়ে একই প্রসঙ্গে সাহস করে বলেই ফেললাম। শুনে তেলে-বেগুনে জ্বলে উঠে বললো, বিয়েটা কি তোমার? যে...।
আসলে আমারই বোঝা উচিত ছিল যেমন কিপটে স্বামী আমার। মাসের সংসার খরচ বাচিয়ে যাও দুই একটা শাড়ি কিনি তাও ওনার সহ্য হয় না। আর তিনিই কি না দেবেন আমাকে অন্যের বিয়েতে শাড়ি!
তৃতীয় দিন যথাসময়ে একটু অন্যভাবে বললাম, আমি যাবো না। তুমি প্রিয়কে (আমার ছেলে) নিয়ে যেও।
এবারও উত্তর না দিয়ে পাশ ফিরে শুলো।
পরদিন অফিস থেকে একটু দেরি করে ফিরলো হাতে একটি প্যাকেট। খুলে দেখি চমৎকার একটি কাতান শাড়ি। সাধারণত ও মার্কেটে যায় না। আমার শাড়িগুলো সব আমাকেই কিনতে হয়। অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে রইলাম। আমাকে কাছে টেনে আদর করে বললো, আমার একমাত্র বৌটি বিয়েতে যাবে না, তা কি হয়? ঘটনাটি এখানে শেষ হলেই বুঝি ভালো হতো। বাস্তবে ঘটলো অন্য রকম।

বড়বোনের একমাত্র মেয়ে দীর্ঘ তিন বছর পর ফ্রান্স থেকে দেশে বেড়াতে এসেছেন। আমার বাসাতেও এলেন। সুন্দর সুন্দর উপহার আর আদরের ভাগ্নিকে কাছে পেয়ে আনন্দে আত্মহারা হলাম। বিভিন্ন কথার মাঝে ভাগ্নি জানালো, বিদেশে সব সময় পার্টিতে যেতে হয়। মাঝে মধ্যে শাড়ি পরে যায়, এবার দেশ থেকে কিছু শাড়ি নিয়ে যাবে ইত্যাদি। কথা বলার ফাকে আলমারিতে রাখা শাড়িগুলো দেখছে আর পছন্দমতো শাড়ি আলাদা করছে। আমার প্রিয় শাড়িতে ওর হাত পড়তেই বললাম, তোমার খালু এটা নিজে পছন্দ করে বেইলি রোড থেকে কিনে এনেছে, মাত্র একবার পরেছি।

ও বললো, তোমার এই শাড়িটা তাহলে নেবো না তবে শ্বশুরবাড়িতে নিয়ে যাচ্ছি, একবার পরার জন্য।

ভদ্রতার খাতিরে বললাম, তোমার খুব পছন্দ হলে নিয়ে নিতে পারো। মুখে বললেও অন্তর কিছুতেই একথায় সায় দিচ্ছিল না।

এর কিছুদিন পরে এক অনুষ্ঠান উপলক্ষে আমাকেও ওর শ্বশুরবাড়ি যেতে হলো। মনে মনে ভাবলাম নিজে থেকে ও না দিতে চাইলেও ফেরার সময় প্রিয় শাড়িটি চেয়ে নেবো। কিন্তু আমাকে অবাক করে দিয়ে শাশুড়ি, ননদ, তাদের সামনে ভাগ্নি শাড়িটা দেখিয়ে বললো, ছোট খালামণি এই কাতান শাড়িসহ এই শাড়িগুলো আমাকে দিয়েছে।

শুনে ওর ননদ বললো, দেখেছো তোমার খালামণি তোমাকে কতো ভালোবাসে?

বুদ্ধিমতী ভাগ্নি আমার, শাড়িটা ফিরে চাইবার কোনো পথই খোলা রাখলো না।

পূর্ব দেওভোগ, মুন্সিগঞ্জ থেকে

টাঙ্গাইল কন্যা

–ফেরদৌসী সাকলায়েন পুন্নি

সবে কলেজে পা রেখেছি। কলেজে জমজমাট পিকনিকের আয়োজন চলছে। কারণ সদ্য ভর্তি হওয়া ফার্স্ট ইয়ারের ছাত্রছাত্রীদের আনন্দ দেয়া এবং বাইরে কোথাও ঘুরিয়ে আনা। সঙ্গে অবশ্যই পুরো কলেজের ছাত্রছাত্রী যাবে।

পিকনিক স্পট বগুড়ার মহাস্থান গড়। সেখানেও আবার আমার প্রথম যাওয়া। সব মিলিয়ে সীমাহীন আনন্দ। বান্ধবীরা সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রত্যেকে শাড়ি পরবে। তাই আমারও পরতে হবে। পড়ে গেলাম মহা দুশ্চিন্তায়। কেননা আমার তখন একটিও শাড়ি নেই। সিদ্ধান্ত হলো, ভাবীর একটি বাসন্তী রঙ–এর শাড়ি পরে পিকনিকে যাবো। সব গোছানো শেষ। কিন্তু সারা রাত ঘুমহীন অবস্থায় কাটলো পিকনিক এবং শাড়ি পরা এ দুই–এর আনন্দে। অন্ধকার থেকেই খুটখাট শুরু করে দিলাম। বড়বোন উঠে সব ঠিকঠাক করে দিলেন। কিন্তু কেন জানি লজ্জায় কারোর সামনে ফ্রি হতে পারছিলাম না। সারাদিনের পিকনিকে হই চই আনন্দে বেশ কয়েকবার বন্ধুদের সাহায্যে কোনো রকমে শাড়িকে ধরে রেখেছিলাম। এরপর বিকেলে বাড়ি ফিরে দেখি শাড়ির করুণ অবস্থা। সারাদিনের সব আনন্দ যেন মাটি করে দিল সেই বিধ্বস্ত শাড়িটি। কয়েকদিন নিজে নিজেই কষ্ট পেলাম সুন্দর শাড়িটির জন্য। কারণ সেটি সম্ভবত কেউ আর দ্বিতীয়বার পরতে পারেনি।

এরপরও শাড়ি পরা বন্ধ থাকেনি। ইউনিভার্সিটিতে গিয়ে এটি শখে পরিণত হলো। মাঝে মধ্যেই শাড়ি পরতাম। অকারণেই হয়তো বন্ধুরা বেশি প্রশংসা করে ফেলতো। তাই ধীরে ধীরে শাড়ি আমাকে আকর্ষণ করতে থাকলো। সবুজ মতিহার চত্বরের আনাচে–কানাচে যখন ডালিয়াসহ বিভিন্ন রঙ–বেরঙের ফুলে ক্যাম্পাস ভরে যেতো সেই সময় প্রতি বছরই আমরা হলের বন্ধুরা শাড়ি পরে দল বেধে ফুলে ফুলে ভরে ওঠা মনোরম জায়গাগুলো ঘুরে বেড়াতাম। সে এক অপূর্ব ভালোলাগা! কল্পনায় নিজেকে মনে হতো আমিই বুঝি অপরূপা এ শাড়িতে। এভাবেই চলছিল সোনার দিনগুলো।

মাস্টার্স ফাইনালের আগেই পরিণয়বন্ধনে আবদ্ধ হলাম পারিবারিক সূত্রে এবং পছন্দের মানুষটির সঙ্গেই। বিয়ের আনুষ্ঠানিকতার পর আবার যথারীতি শুরু হলো হলের জীবন এবং বেশি পরিবর্তন যেটি হলো তা হলো শাড়ি পরতে ভালোলাগা। প্রায়ই বিভিন্ন ধরনের শাড়ি পরে ঘুরে বেড়াচ্ছি। বান্ধবীরা লক্ষ্য করেছে যে, আমি নাকি টাঙ্গাইল শাড়িই বেশি পরছি এবং সেগুলোয় রঙ ও ডিজাইনও নাকি তাদেরকে আকৃষ্ট করেছে। তা থেকেই তারা আমাকে *টাঙ্গাইল কন্যা* ডাকা শুরু করেছে। এরপর টাঙ্গাইল শাড়ির প্রতি আরো আকৃষ্ট হয়ে পড়লাম। অবশ্য সেই সময় টাঙ্গাইলের সুতি শাড়ির ভ্যারাইটিই আমাকে মুগ্ধ করতো।

প্রবাসে থেকেও দেশি শাড়িই পরি। কারণ সেটিই আমার পরিচয়। প্রবাসে আমরা প্রবাসী বাঙালি মহিলারা প্রতিটি দেশি অনুষ্ঠানেই শাড়ি পরি এবং গ্যাদারিংগুলোতেই দেশের নিত্যনতুন শাড়িও দেখতে পাই। প্রবাসী ভাইদের বিদেশিনী স্ত্রীরাও আমাদের ওপেন সাংস্কৃতিক প্রোগ্রামগুলোতে শাড়ি পরে। তাদেরকে দেখলে মনে হয় তারা যেন শাড়ির দোকানের সাজানো পুতুল। সত্যিই তখন খুব ভালো লাগে। আর দেশকে রিপ্রেজেন্ট করার বিষয় থাকলে তো অবশ্যই শাড়ি পরি। নিজের কর্মক্ষেত্র বৃটিশ ইন্টারন্যাশনাল স্কুল। এদের ইন্টারন্যাশনাল ডে, মিউজিকাল ইভিনিং, মাফটি ডে ইত্যাদিতে নিজে শাড়ি পরি। তাদের ন্যাপৃসিয়েটি মনোভাব আমাকে মুগ্ধ করে এবং নিজের দেশের শাড়ি সম্পর্কেও তাদেরকে তথ্য দিতে পেরে আমার ভীষণ ভালো লাগে।

কয়েকদিন আগেই স্কুলে হয়ে গেল *ড্রেস অ্যাজ ইউ লাইক শো।* সেটিতে আমার একজন জার্মান কলিগ ফ্রাউ ব্রাওয়ার পরেছিলেন শাড়ি, টিপ এবং লম্বা কালো উইগ। অপরূপা লাগছিল তাকে। বাঙালি মেয়ে সেজে তিনি সেদিন সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছিলেন বিচারকদের দৃষ্টিতে। তিনি বলেছিলেন এটি তোমারই প্রাপ্য। কেননা তুমিই আমাকে সাজিয়েছো। এভাবেই ছোট ছোট উদ্যোগে শাড়ি বিদেশে একদিন ব্যাপক সাড়া জাগাবে।

যেমনটি হয়েছিল বার্লিন দূতাবাসের এক আয়োজনে। বার্লিন দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত পত্নী আয়োজন করেছিলেন এক সুদৃশ্য শাড়ির ডিসপ্লে। তিনশ প্রকারের শাড়ির মধ্যে আজকের মডার্ন এবং একশ বছরের পুরনো শাড়ির সংগ্রহ সবাইকে তাক লাগিয়েছিল। শুধু মহিলা অতিথি নিয়ে এই দিন এটি ছিল মহিলাদের রাজ্য। অংশগ্রহণকারী এবং অতিথি মিলে জমজমাট এই কালারফুল শাড়ির মিলন মেলায় মডেলরাও ভীষণ প্রাণবন্ত ছিল। বাংলার গ্রাম এবং শহরকে দেশি গানের সুরের সঙ্গে মিলিয়ে অপূর্ব সব পর্ব ছিল যা দর্শকরা সত্যিই খুব এনজয় করেছে। জার্মান বড় বড় মহিলা সেলিব্রেটিসহ প্রায় পঞ্চাশটি দেশের রাষ্ট্রদূত পত্নীরা উপভোগ করেছেন শুধু শাড়ি নিয়েই রাখা বিভিন্ন ধরনের পর্বগুলো। সেই সঙ্গে তারা জেনেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গার বিখ্যাত সব শাড়ির নামও এবং অনেকে

আগ্রহও প্রকাশ করেছে এগুলো আমরা কোথা থেকে সংগ্রহ করতে পারি। মিসেস দিলশাদ রহমানের আন্তরিক উত্তর ছিল, বাংলাদেশে যাও, আমাদের সুন্দর দেশকে দেখো এবং তোমাদের পছন্দ মতো সুন্দর সুন্দর শাড়ি কিনে আমাদের ভালোবাসাকে আরো মধুর করো।

বার্লিন, জার্মানি থেকে

বিব্রত

–এ হক খোকন

কিশোর কুমার–এর একটি গানের কলি – *পরেছে লাল শাড়ি যাবে সে কোন বাড়ি, শ্বশুরবাড়ি, সেজেছে সুন্দরী, আহা মরি মরি দেখবে যে সেই মজে যাবে... আহা কি দারুণ দেখতে।*

সত্যিই শাড়ি পরা লজ্জা মধুর বধূর সাজে সব নারীকেই অপূর্ব অপরূপা মোহনীয় লাগে। শাড়ির আচলে ঢাকা বধূয়ার মুখটি যদি নিজের বধূর হয় তো মজে যাওয়াই স্বাভাবিক। আমার জীবনে শাড়ি বিষয়ক অভিজ্ঞতা সুখ–দুঃখের স্মৃতিতে গাথা। সেই স্মৃতিকথাই পাঠকদের কাছে উপস্থাপন করছি।

হবিগঞ্জ জেলার এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে আমার জন্ম ষাটের দশকের গোড়ার দিকে। মায়ের শাড়ির আচল ছেড়ে যখন থেকে মক্তবে হুজুরের কাছে আরবি শিক্ষা নিই তখন দেখতাম কিছু মেয়ে শাড়ি পরে মক্তবে আসতো। অল্প বয়সী মেয়েরা শাড়ি পরায় দক্ষ ও অভ্যস্ত না থাকায় মাঝে মধ্যে হুজুর পাঠদান করে কোন কাজে বাইরে গিয়ে আবার মক্তবে প্রবেশের সময় ছোটাছুটি করতে গিয়ে শাড়িতে পেচিয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়তেন। তখন অন্যরা হাসাহাসি করে মজা উপভোগ করতো। অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েরা এক পাশে আর ছোট ছেলেমেয়েরা যে যার সুবিধা মতো বসতো। মাঝে মধ্যে ছোটমেয়েদের শাড়ি খুলে যেতো। তখন অপেক্ষাকৃত বড়মেয়েরা আবার ঠিকভাবে শাড়ি পরিয়ে দিতো।

ছোট ছেলেমেয়েদের ছুটি হয়ে যেতো আগে এবং অপেক্ষাকৃত বড় মেয়েদের ছুটি হতো পরে। ফলে ছোটবেলায় মক্তব থেকে ফেরার পথে কখনো বৃষ্টি নামলে শাড়ি পরা ছোটমেয়েদের শাড়ি মাথায় দিয়ে বাড়ি ফিরতাম।

একদিন মক্তবে এক কিশোরী মেয়েকে পড়া না পারার কারণে হুজুর বেদম প্রহার করায় মার সহ্য করতে না পেরে মেয়েটি প্রস্রাব করে দিল। তার শাড়ি ভিজে একাকার, সঙ্গে মক্তবের মেঝে নষ্ট হয়ে গেল। তখন মেয়েটি লজ্জা, অপমানে ভেজা শাড়ি নিয়ে সেইদিন বাড়ি ফিরে আর কখনো মক্তবে পড়তে আসেনি।

মক্তব পরিষ্কার করার জন্য বালতি দিয়ে পানি এনে ধোয়ামোছার জন্য সেদিন সবাইকে কাজ করতে হয়েছে। শাড়ি পরা সেই মেয়েটির নাম এতোদিনে ভুলে গেছি। কিন্তু তার অপমানিত চেহারা ও পরবর্তী কালে মক্তব পরিষ্কার করার কষ্টের স্মৃতি আজো মনে পড়ে।

মক্তব্যের পাঠ শেষে প্রাইমারি স্কুলে পড়ার সময় স্কুল শিক্ষিকাদের শাড়ি পরে আসতে দেখেছি। কখনো কোনো বিষয়ে লেখা জমা দিতে বললে লেখা শেষে সবাই এক সঙ্গে আপাকে ঘিরে দাড়াতাম। আপা খাতা নিতে দেরি করলে কেউ কেউ আপার শাড়ি ধরে টান দিয়ে বলতো আপা

আমারটা দেখেন। কখনো আপারা ক্ষেপে যেতেন আবার কখনো শান্ত স্বরে দেখবো বলে অপেক্ষা করতে বলতেন।

গ্রামের স্কুলে যাতায়াতের রাস্তা বৃষ্টির দিনে পিচ্ছিল কাদায় ভরে যায়। বৃষ্টির দিনে আপাদের শাড়ি বৃষ্টির পানি ও কাদায় নষ্ট হলেও আপারা বাড়ি না ফিরে সেই শাড়ি নিয়েই ক্লাস করাতেন। আপাদের সেই কষ্টের স্মৃতি আজো মনে পড়ে।

একবার বৃষ্টির দিনে আপা স্কুল ছুটি শেষে বাজারের পাশে বাশের সাকো দিয়ে পার হতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলেন। আপার শাড়ির আচল বাশের খুটিতে আটকে ছিড়ে গেল। বাজারের লোকজন যেন ভীষণ মজা পেল। আপা খালে পড়ে কাদা-পানি মেখে ছেড়া ভেজা শাড়ি কোনোভাবে জড়িয়ে খাল থেকে উঠে এলেন। বাজারের লোকদের বিদ্রূপের হাসি সহ্য করতে না পেরে আপা কেদে ফেলেছিলেন। পরে বাজারের পাশের বাড়িতে আপা শাড়ি পাল্টে বাড়ি ফিরেছিলেন। প্রাইমারি স্কুলের সেই শিক্ষিকার শাড়ি ছেড়া ও ভিজে একাকার এবং কান্নার স্মৃতি এখনো সে পথে গেলে মনে পড়ে।

তালিবপুর, হবিগঞ্জ থেকে

লিমিং আর টয়ইন

– শামীম চৌধুরী

শার্ট ছাইড়া পর শাড়ি, হইয়া যাও বাঙালি নারী, লাইলী হইয়া মজনু খোজো, পাবে খাটি প্রেম...।

চায়নিজ তরুণী লিমিংয়ের প্রশ্নের জবাব হিসেবে ইংলিশ ট্রান্সলেশন করে করে গানটি গেয়েছিলাম প্রায় শতাধিক বিদেশি দর্শক শ্রোতাদের সামনে উচু মঞ্চের ওপর দাড়িয়ে। কারণ কয়দিন আগে বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডার টেবিলে লিমিং প্রশ্ন করেছিল, কিভাবে প্রকৃত ভালোবাসা পাওয়া সম্ভব? কিভাবে?

একে অপরের সুখের দিকে তাকিয়ে সবাই একই প্রশ্ন করছিল এবং তার মনগড়া সমাধান দেয়ার চেষ্টা করছিল প্রশ্নদাতারা নিজেই। সেখানে আমারও একই প্রশ্ন থাকলেও উত্তর জানা ছিল না। তাই ওই মুহূর্তে আমার জবাব ছিল, জানি না।

কিন্তু পার্টিতে গানের মাধ্যমে লিমিংয়ের প্রশ্নের জবাব দিতে গিয়ে যে নাইজেরিয়ান কৃষ্ণাঙ্গী তরুণী টয়ইন-এর মাঝে প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করবে তা কখনো ভাবতেও পারিনি। গত উইকএন্ডে কেএলসিসি-র এক রেস্টুরেন্টে উপস্থিত হয়ে তা বুঝতে পারলাম। সেখানে আমাদের ডেটিং জোন।

টয়ইন সেদিন পরে এসেছিল নোংরা একটি শাড়ি। পরার ভঙ্গিটা ছিল বিশ্রী। বন্ধুরা শাড়ি পরা মেয়েদের সচরাচর দেখেনি বলে সঠিক-বেঠিক যাচাই করার ক্ষমতাও ছিল না। মুগ্ধ হওয়ার ভঙ্গি করে বললাম, *ওয়াও সো নাইস! ভেরি বিউটিফুল!*

বন্ধুরা ইয়ারকি করতে শুরু করলো টয়ইন এবার বাংলাদেশি প্রেম খুজছে। হা-হা-হা।

তাদের সঙ্গে লিমিং হাসিতে শেয়ার হলেও অন্তরে সেই রহস্যটা মেনে নিতে পারেনি। কারণ লিমিংয়ের সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের বন্ধুত্ব এবং...।

টয়ইন–কে খুশি করার জন্য ভালোভাবে তাকে দেখতে শুরু করলাম। শাড়িটা নতুন এবং দামি হলেও তা নোংরা লাগছিল। টয়ইন–এর মতো আফ্রিকান কৃষ্ণাঙ্গী মেয়েদের দামি শাড়ি পরলেও যে এতো বিশ্রী দেখায় সেদিনই সেটা বুঝেছিলাম। পরার ভঙ্গি সে যাই হোক। আমার ক্ষণস্থায়ী প্রশংসায় টয়ইন গলে গেল। হয়তো মনে মনে বিধাতাকে ছোট একটা ধন্যবাদও জানালো যে উদ্দেশ্যে আজ সে শাড়ি পরেছে।

রাতে আমার সেলুলারে টয়ইন–এর পাঠানো একটা মেসেজ রিসিভ করলাম। হাই! নিশ্চয়ই তোমার বোধশক্তি দুর্বল নয়। শাড়ি পরার অর্থটা আশা করি বুঝতে পেরেছো...।

আমি রিপ্লাই কি করবো বুঝতে পারছি না। অবশ্যই তাকে খুশি করানোর জন্য কিছু একটা বলতে হবে তার সঙ্গে জানিয়ে দিতে হবে। টয়ইন আমার ব্যাপারে সবকিছু জেনেও...। আমার স্রেফ একজন বান্ধবী টয়ইন। তাকে আমার পছন্দের প্রধান কারণ মেয়েটির অমায়িক ব্যবহার।

সবার সামনে তাকে একদিন বলেছিলাম বিদেশি বেস্ট ফ্রেন্ডের নাম অন্তর্ভুক্ত করা হলে টয়ইন–এর নামটাই আমি লিখবো প্রথমে। কিন্তু সে যে এতো দূর চলে এসেছে, তা কল্পনাও করতে পারিনি।

লিমিং আর টয়ইন সম্পর্কে ভেবে এক সময় ঘুমিয়ে পড়লাম। সে রাতে স্বপ্নও দেখলাম একটা, একজন আফ্রিকান তরুণী শাড়ি পরে নদীর ধারে বেড়াচ্ছে, তাদের মাঝে টয়ইন–কেও দেখছি। সবাইকেই সুন্দর লাগছে অথচ টয়ইন–কেই শুধু কুৎসিত লাগছে। মাঝে মধ্যে সে শাড়ি বদল করছে অথচ কোনো শাড়িতেই তাকে মানাচ্ছে না। এবার আমার কাছে এসে টয়ইন বললো, এই শাড়িটা পরে কেমন লাগছে দেখো তো।

ভালো করে তাকিয়ে দেখি সে টয়ইন নয়, লিমিং এবং তাকে তখন খুব সুন্দর লাগছে যদিও বা শাড়িটা ভালো মতো পরতে পারেনি। শাড়ি পরলে চায়নিজ তরুণীদের যে এতো সুন্দর লাগে তা আগে জানা ছিল না। নাকি শুধু লিমিংকেই সুন্দর লাগে তাও বুঝতে পারছি না। লিমিং আবারও জিজ্ঞাসা করলো, কি ব্যাপার, কিছু বলছো না যে, এই শাড়িটা পরে কেমন লাগছে?

লিমিংয়ের ঘাড়ে একটা হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটা ছোট করে চুমু খেলাম। বললাম, প্রিয় মানুষটি যেমন শাড়িই পরুক আর যেভাবেই পরুক তাকে অবশ্যই সুন্দর লাগবে। তোমাকেও সুন্দর লাগছে লিমিং, ভেরি নাইস! ভেরি বিউটিফুল।

সঙ্গে সঙ্গে স্বপ্ন ভেঙে গেল। হাতে রাখা মোবাইলে টয়ইন–এর পাঠানো আরও দুটি মেসেজ জমা হয়ে আছে।

কি ব্যাপার, রিপ্লাই করছো না যে? বুঝেছি লিমিংকে তুমি ভুলতে পারছো না। ঠিক না, সত্যিই শামীম? তোমার ব্যাপারে আমি জেনেশুনেও নিজেকে বোঝাতে পারছিলাম না। তবে শাড়ি পরে যে তোমাকে খুশি করাতে পেরেছি তাতেই নিজেকে ধন্য মনে করছি। হিঃ–হিঃ–হিঃ।

সেলুলারে রাইট মেসেজ সিলেক্ট করে রিপ্লাই দিলাম। প্লিজ টয়ইন, আমাকে ক্ষমা করো।

কুয়ালা লামপুর থেকে

ম্যাডাম

– বন্যা

আমার নাম বন্যা। ঝিনাইদহ জেলার কোনো এক অঞ্চলে আমার বাসা। আমার জীবনে এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল যে ঘটনার কারণে আমার পড়াশোনা আর হয়নি। ঘটনা ছিল ১৯৯৫ সালের। আমি তখন এইচএসসি পাস করেছি। অনেক বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অ্যাডমিশন টেস্ট দেয়ার পর কোথাও চান্স পাইনি। কিন্তু বড় শহরে বা ঢাকায় পড়া আমার খুব ইচ্ছা। তাই ঢাকার এক মহিলা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হলাম। ঢাকাতে আমার এক দূরসম্পর্কের মামা ছিলেন তার বাসায় থাকতাম।

আমার চেহারা, শরীরের গঠন, উচ্চতা, দেহের রঙ সব কিছু মিলিয়ে এতোই চোখ ধাধানো ছিল যে, কোনো যুবক আমার দিকে তাকালে সহজে চোখ ফিরিয়ে নিতে পারতো না। কিন্তু আমার দুঃখ হলো, আমি কোনো যুবকের কাছ থেকে লাঞ্ছিত না হয়ে, হলাম মা বয়সের একজন নারীর কাছ থেকে।

মে আই কাম, ম্যাডাম?

ইয়েস। সিট ডাউন প্লিজ, জাস্ট মিনিট, ওয়েট।

আমি চেয়ারে বেশ কয়েক মিনিট বসে থাকার পর হঠাৎ ম্যাডাম বললেন, কি ব্যাপার বলো।

ম্যাডাম, আমি হস্টেলে সিট পাইনি।

তুমি কি নিউ ফার্স্ট ইয়ার?

জি।

তাহলে তো তুমি এখনই সিট পাবে না। তোমাকে ডাবলিং করতে হবে তিন চার মাস।

আমি কাউকে চিনি না, কার সঙ্গে বা কিভাবে ডাবলিং করতে হয় তাও জানি না।

আচ্ছা, তুমি আজ বিকেলে হস্টেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করো। দেখি কি করতে পারি। আর হ্যা, তুমি আসার সময় একটা দরখাস্ত লিখে নিয়ে আসবে। তা তোমার নাম তো শোনা হলো না, কি নাম তোমার?

বন্যা।

শুধুই বন্যা?

জি না, আমার ডাক নাম বন্যা। আর পুরো নাম হলো মিস লাইলা জাকিয়া আমান লুলুউল মাকনুন উম্মে কুলসুম তামান্না তাবাসসুম সাজিয়া খানম বন্যা।

ম্যাডাম আমার নাম শুনে হঠাৎ আমাকে জড়িয়ে ধরে বেশ কয়েকটি কিস করলেন। আমি পুলক অনুভব করলাম।

বললেন, চমৎকার নাম তোমার। এতো বড় নাম এর আগে কখনো শুনিনি। তোমার নামের রহস্য কি বলো তো?

আমাদের পরিবার কন্যা সন্তান সর্বোচ্চ দশ বছর বাচে। একমাত্র আমি ব্যতিক্রম। তাই যারা মারা গেছে তাদের নাম আমার সঙ্গে যুক্ত করে এই নাম রেখেছে।

অবাক কাণ্ড! এটা কিভাবে সম্ভব?

তা জানি না।

ওকে। বিকেলের কথা ভুলে যেও না।

ম্যাডামকে সালাম দিয়ে রুম থেকে বেরিয়ে এলাম।

কলেজ করার পর কিছু শপিং সেরে বিকেলে ম্যাডামের বাসায় উপস্থিত হলাম। ম্যাডাম আমাকে পেয়ে ভীষণ খুশি হলেন। ড্রইং রুমে এক সঙ্গে নাশতা খেলাম।

তারপর বেশ কয়েক মিনিট গল্প করার পর আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কোথায় উঠেছো? সেখানে টেলিফোন আছে?

দূরসম্পর্কের এক মামার কাছে উঠেছি। সেখানে টেলিফোন আছে।

রিং করে বলো আজ তোমার যাওয়া হচ্ছে না।

ম্যাডাম, আমার বাসাতে বিশেষ কাজ আছে।

কি কাজ?

আমার আগামীকাল টিউটরিয়াল পরীক্ষা।

এটা তেমন কোনো সমস্যা নয়।

বাসাতে রিং করলাম। মামার সঙ্গে কথা বলার পর মামা ম্যাডামের সঙ্গে কথা বলে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোনো সমস্যা নেই তো?

বললাম, না, কোনো সমস্যা নেই।

মামা রিসিভার রেখে দিলেন।

এরপর আমাকে কাছে ডেকে বেশ আদর করে আবার কিস করলেন।

স্নান করতে চাইলাম।

ম্যাডাম বললেন, আমাকেও স্নান করতে হবে। চলো দুজনেই এক সঙ্গে স্নানটা সেরে ফেলি।

আমার জীবনে দুজন একই সঙ্গে, একই বাথরুমের মধ্যে এই প্রথম স্নান করছি। ম্যাডামের স্নান করার দৃশ্য দেখে আমার লজ্জা করতে লাগলো। সমস্যা হলো ম্যাডাম আমাকে সাবান মেখে দিতে চাইলেন। বাধা দেয়া সত্ত্বেও সাবান পিঠে লাগাচ্ছেন আর একটু পর পর দুই হাত আমার বগলের ভেতর দিয়ে বুকটা টিপছেন। আমার লজ্জা করছে। এভাবে কোনো রকম তাড়াতাড়ি স্নান করে রুমে এসে কাপড় পরতে শুরু করছি। আমার থ্রি পিস যেহেতু ভেজা সেহেতু ম্যাডামের শাড়ি পরতে হচ্ছে। কিন্তু শাড়ি পরতে পারি না। তারপরও কোনো রকমে শাড়ি পেচিয়ে পরে ম্যাডামের রুমে ঢুকলাম। ম্যাডাম আমাকে দেখে অবাক হয়ে তাকিয়ে হাসছেন।

তুমি যে শাড়ি আজই প্রথম পরেছো তা তোমাকে দেখেই বোঝা যাচ্ছে। এসো তোমাকে শাড়ি পরা শিখিয়ে দিচ্ছি।

ম্যাডাম আমার শাড়ি খুলে ফেললেন। লজ্জায় দুই হাত দিয়ে বুক দুটোকে ঢাকার চেষ্টা করতে লাগলাম। ম্যাডাম শাড়ি পরাচ্ছেন আর শরীরের বিভিন্ন স্থানে হাত দিয়ে কাতুকুতু দিচ্ছেন। আমি জড়সড়ো হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও ম্যাডাম আমার শরীর নিয়ে এমনভাবে খেলা করতে লাগলেন যে, আমি সব কিছু ভুলে গিয়ে হঠাৎ ম্যাডামকে জড়িয়ে ধরলাম।

ম্যাডাম আমার শরীরের সমস্ত কাপড় খুলে ফেললেন। আমার শরীর নিয়ে ম্যাডামের পাগলামি দেখে অবাক হয়ে গেলাম। জানি না একটি ছেলের মাধ্যমে কেমন আনন্দ পাওয়া যায়। তবে ম্যাডামের মাধ্যমে যে সুখ, পুলক অনুভব করলাম তা আজীবন মনে থাকবে।

রাতে আমাকে ম্যাডামের পাশে শুতে হলো। ম্যাডামের স্বামী সিঙ্গাপুর থাকেন। সারা রাত ম্যাডাম আমার শরীরে অনেক কিছু করলেন এবং আমাকে দিয়ে ম্যাডামের শরীরেরও বিভিন্নভাবে অনেক কিছু করিয়ে নিলেন।

সকালে ম্যাডাম বললেন, যতোদিন সিট পাচ্ছো না ততোদিন তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে।

বাসায় ফিরলাম। তিন দিন পর সব কিছু নিয়ে ম্যাডামের বাসায় উঠলাম। তারপর থেকে চলতে লাগলো আনন্দ খেলা।

সিটের অভাবে যে চার মাস আঠারো দিন ছিলাম তার একটি রাতও ম্যাডামের কর্মসূচি থেমে থাকেনি। সিটে ওঠার পরও মাঝে মধ্যে ম্যাডাম আমাকে নিয়ে অনেক কিছু করে বেড়িয়েছেন যা আজ আমার জীবনের কাল হয়ে দাড়িয়েছে।

আরাপপুর, ঝিনাইদহ থেকে

সাধ ও সাধ্য

– চেমন আরা চৌধুরী পেলী

আমার সবচেয়ে প্রিয় মানুষ আমার মা। যার অস্তিত্ব আমার ভেতরে সেটে রেখেছি। আমার দুখিনী, সংগ্রামী মা যার দুহাত দিয়েই সন্তুষ্টি পাওয়া বিষয়ে লিখে নয়, সেই মাকেই আমার প্রথম চাকরির প্রথম শাড়ি উপহার দেয়ার আনন্দ পাওয়ার আনন্দ না লিখে তৃপ্ত হবো না। কিন্তু মা স্বর্গাদপী গরীয়সী, তাকে সন্তুষ্ট করা মোটেই শক্ত নয়। হয়তো স্বল্পে সন্তুষ্ট থাকতে পারেনি শিবপত্নী চণ্ডি। কিন্তু আমার মা – ঠিক বুঝে উঠতে পারি না, দেবী না, অন্য কিছু। তিনি মর্তের পার্থিব সুখের জন্য মোটেই লালায়িত নন।

আমার মা খুবই সাধারণ। মায়ের চাওয়ার মধ্যে ঝামেলামুক্ত, নির্মল পরিবেশে একটু মাথা গোজা। বাড়তি চাওয়া বলতে যা বোঝায় তা হলো আদাসহ পান। মায়ের অসম্ভব প্রিয় একটি আহার। যে কেউ পটাতে পারে মাকে এ পান দিয়ে। আমার প্রথম মাসের বেতন দিয়ে মাকে জরির মোটা কালো পাড়ের ঘিয়ে রঙের শাড়ি উপহার দিই। খুব উচ্ছ্বাস নিয়ে মাকে সেই শাড়িটা দিই। কিন্তু মা রাগে অগ্নিমূর্তি।

মায়ের ভাষ্য, কেন শুধু বাড়তি টাকা খরচ করা। এ টাকাটা দিয়ে সংসারের সামান্য হলেও অভাব ঘুচানো যেতো।

মনটা খারাপ হলো ঠিকই কিন্তু আশা ছাড়িনি। রাতে মাকে অনেক আদর করে বলি, মা, তোমার শাড়িটা একটু দেখো, দেখবে তোমার ভালো লাগবে।

নরম সুরে বললেন, এই বয়সে এতো জৌলুস কি মানায়? তোর বাবা তো নেই, কে দেখবে এখন। যখন সাধ ছিল তখন সাধ্য ছিল না। আর এখন...!

মায়ের কথা শুনে মনটা ভারি হয়ে গেল। কিন্তু তা মাকে বুঝতে দিইনি। বলি, বাবা নেই তো কি হয়েছে? আমরা আছি না? আমরাই আমাদের মাকে দেখবো।

এখন আমার দেয়া সেই শাড়িটা মায়ের সবচেয়ে পছন্দের শাড়ি। কোনো অনুষ্ঠান ছাড়া এটা পরে না। এটা দেখে আমার খুব ভালো লাগে।

চট্টগ্রাম থেকে